ISSN 2349-7343

নবম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ২০২১

সম্পাদক

সৌমেন রক্ষিত

পত্রিকা দপ্তর

হরিগ্রাম, পোঃ-কাঁটাপাহাড়ী

বাঁকুড়া-৭২২১৩৬, পশ্চিমবঙ্গ

নবম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ২০২১
ISSN 2349-7343

সম্পাদক : সৌমেন রক্ষিত

প্রচ্ছদ : স্বরলিপি

অক্ষরবিন্যাস : স্বরলিপি

সম্পাদকীয় দপ্তর
'স্বরলিপি'
দামোদরপুর, পোঃ ভাগাবাঁধ, বাঁকুড়া-৭২২১৪৬
পশ্চিমবঙ্গ, ফোন- ৯৪৭৭৮৯৫৪৪৮
ই-মেল: sreejanipotrika@gmail.com

৫০ টাকা

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয়

প্রবন্ধ

‘গাই গীত শুনাতে তোমায়’
রুহিদাস বণিক ৫

সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং ‘প্রবাসী’-র পাতায় মননশীল রচনা
কৌশিক মুখার্জ্জী ২২

বর্তমান যুব সমাজ ও স্বামী বিবেকানন্দ
মিলন মিশ্র ৩২

বাঁকুড়ায় বিজয়ার উৎসব
সুখেন্দু হীরা ৪০

শুশুনিয়া অঞ্চলের আদিবাসী সাঁওতালদের জীবন ও সংস্কৃতি
সৌমেন রক্ষিত ৪৬

গল্প

নির্বোধ
প্রশান্ত কুমার ঝরিয়াৎ ৫৮

সম্পাদকীয়

....

দেশ তথা বিশ্বের পরিস্থিতিতে কেমন একটা টালমাটাল অবস্থা লক্ষ করা যাচ্ছে ইদানীং। করোনার প্রকোপ থেকে শুরু করে বিশ্ব রাজনীতি। সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের জীবন যাপনে তাই দেখা দিচ্ছে হাজারো প্রতিবন্ধকতা। তবু বসে নেই সুস্থ মনন ও মানসিকতা। বন্যার প্রকোপ হোক, কিংবা করোনার করাল গ্রাস, দারিদ্র কিংবা অসহায়তা—মানুষ ছুটে চলেছে মানুষের পাশে দাঁড়াতে। এ চিত্রও ক্রমশ বিস্তারলাভ করছে। সেই সূত্র ধরেই প্রত্যেকের মানসিকতায় সদর্থক চিন্তার উদয় হয়ে চলেছে—না, এখনো মনুষ্যত্ব বেঁচে আছে, এখনো ভালো মানুষ আছে। এই ভালো মানুষের সংজ্ঞায় নিজেদের সংজ্ঞায়িত করতে পারলেই ঐসব সদর্থক ঘটনার উন্নততম প্রভাব।

সময়কে কাজে লাগাতে না পারলে কেবল একটা নিস্ফল জীবন ও শরীরকে পরিবেশে জীবন্ত জীবাশ্মের মতো করে রাখা হয়। অথচ সময় হল ক্রমবিকাশের একটি স্রোত। সেই স্রোতে না ভাসলে এগোনো যায় না। তাই যতই ঝড়-ঝঞ্ঝা আসুক না কেন, এগিয়ে যাওয়াটাই একমাত্র লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হওয়ার ক্ষেত্রে সামান্য সহায়ক হতে আবারো প্রকাশোন্মুখ ‘সৃজনী—সাহিত্য সন্ধানে’। এবারে সামান্য কিছু প্রবন্ধ দিয়ে ডালি সাজিয়ে সাহিত্যের আঙিনায় হাজির পত্রিকার নবম বর্ষের প্রথম সংখ্যা।

“গাই গীত শুনাতে তোমায়”

রুহিদাস বণিক

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ – দু’জনের জীবনেই সঙ্গীতের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। বস্তুত দুজনের প্রথম সাক্ষাৎকারই ঘটেছিল সঙ্গীতের মাধ্যমে। একথা সকলেই জানেন যে, মানুষের মনের উপর সঙ্গীতের প্রভাব অমোঘ ও অপরিসীম। বিশেষত আধ্যাত্মিক পথে তো কথাই নেই! সাধকের সাধনার একটা অঙ্গই হল সঙ্গীত। এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, “মনুষ্য মনের উপর সঙ্গীতের প্রচণ্ড প্রভাব – উহা মুহূর্তে মনকে একাগ্র করিয়া দেয়। দেখিবেন, অতিশয় তামসিক জড়প্রকৃতি ব্যক্তিগণ – যাহারা এক মুহূর্তও মন স্থির করিতে পারে না, তাহারাও উত্তম সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়, একাগ্র হইয়া যায়।”

ঠাকুরের সঙ্গীতপ্রীতি — ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গান খুব ভালোবাসতেন। তবে অবশ্যই সে গান মহান ভাব উদ্দীপক বা ঈশ্বরীয় চেতনা সম্পন্ন হতে হবে। তিনি নিজে খুব ভাল গাইতে পারতেন। গলার স্বর ছিল আসাধারণ। সুর তাল ছন্দ সম্পর্কে জ্ঞান ছিল অসাধারণ। কথিত আছে ছেলেবেলায় তিনি একদিন পাঠশালা কামাই করে বনের মধ্যে (মানিক রাজার বাগানে) বন্ধুদের নিয়ে গিয়ে গান ও পৌরাণিক যাত্রাপালা অভিনয় করছিলেন। খবর পেয়ে

গুরুমশাই সেখানে যান শাস্তিবিধানের উদ্দেশ্যে। কে গান গাইছিল তিনি জিজ্ঞাসা করলে বাকি ছাত্ররা গদাধরকে দেখিয়ে দেয়। গুরুমশাই তখন গদাইকে গান গাইতে বলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গদাই গান গাইতে অসম্মত হলে তিনি শাস্তি দিবেন। কিন্তু সহজ সরল গদাধর সত্যিই গান আরম্ভ করলেন এবং গানের মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে কখন যে তাঁর হাত থেকে ছড়িখানি পড়ে গেছে তিনি বুঝতেই পারেননি। গান শেষে গুরুমশাই নিজেই ভাবাবিষ্ট । তিনি গদাইকে শাস্তি তো দিলেনই না, উপরন্তু তাঁকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন।[১] সুতরাং সঙ্গীত যে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ প্রিয় জিনিস তা সহজেই অনুমান করা যায়। কথামৃতে আমরা ২৪০ খানি সঙ্গীতের তালিকা পাই যেগুলি বিভিন্ন সময়ে ঠাকুর নিজে গেয়েছেন, বা অন্য কেউ তাঁকে শুনিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই গানগুলির অধিকাংশই নরেন্দ্রনাথের জানা ছিল।

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতসাধনা— সেকালে উত্তর কলিকাতার সিমুলিয়ার দত্ত পরিবার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মতই ছিল কলাবতী বা ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের সাধনাক্ষেত্র ও পীঠস্থান। সেখানে প্রতি সপ্তাহে শনি ও রবিবারে দুদিন কলাবতী সঙ্গীতের আসর বসত, নরেন্দ্রনাথ তা সুকুমার বয়স থেকেই শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর পিতামহ দুর্গাপ্রসাদ দত্ত, পিতা বিশ্বনাথ দত্ত প্রমুখরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রসগ্রাহী ও সমর্থক ছিলেন। স্বামীজির মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন – "পূজনীয় বিশ্বনাথ দত্ত জীবনের এক সময়ে ওস্তাদ রাখিয়া কিছু সঙ্গীতও অভ্যাস করিয়াছিলেন।.." পিতার কাছেই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত শিক্ষার হাতে খড়ি। তাঁর কণ্ঠসঙ্গীতের প্রথম শিক্ষক ছিলেন বেণী ওস্তাদ (গুপ্ত)। এছাড়া ওস্তাদ আহম্মদ খাঁ, উজির খাঁ এবং জোয়ালাপ্রসাদের কাছেও তিনি শিক্ষা নেন। কাশী ঘোষালের কাছে শিখেছেন তবলা, পাখোয়াজ। এছাড়া তিনি এসরাজ শিক্ষা করেন। মৃদঙ্গও খুব ভালো বাজাতে পারতেন।[২] সেইসময় বাংলার সাধারণ সাংস্কৃতিক জগতে তরুণ নরেন্দ্রনাথের স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ পরিচয় ছিল গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞ রূপেই। কুড়ি বাইশ বছরের মধ্যেই তিনি বয়সের গণ্ডীকে অতিক্রম করে বিজ্ঞ সমাজে সঙ্গীতের অথরিটি হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন।[৩] স্বামীজির জীবনীকার প্রমথনাথ বসু মন্তব্য করেছেন, "[নরেন্দ্রনাথ] যেখানে যাইতেন সেখানেই গান গাহিতে অনুরুদ্ধ হইতেন—সকলেই তাঁহাকে ওস্তাদের ন্যায় খাতির যত্ন করিত। এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁহাকে একজন অথরিটি বলিয়া গণ্য করিত।"[৪]

গানেই হল পরিচয়— ১৮৮১ সালের নভেম্বর মাসের কোন একদিনের ঘটনা। নরেন্দ্রনাথ সেই সময় এফ. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। বয়স প্রায় উনিশ বছর। সেইদিন তাঁর ডাক পড়ল তাঁরই বাড়ির কাছাকাছি শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাড়িতে। সেখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসেছেন একটি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে। ঠাকুর গান শুনতে ভালবাসেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, এলাকায় সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবে তখন নরেন্দ্রনাথ ভালোরকম পরিচিত ছিলেন। তাই গায়ক হিসেবে ঐ অনুষ্ঠানে তাঁর ডাক পড়ল। নরেন্দ্রনাথ ঐ অনুষ্ঠানে গিয়ে গান শুনিয়ে সবাইকে পরিতৃপ্ত করলেন। ঠাকুর এই নবাগত গায়কের

গান শুনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। সুরেন্দ্রনাথকে ডেকে এই যুবকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাঁকে ও রামচন্দ্র দত্তকে বিশেষভাবে বলে দিলেন এই যুবককে দক্ষিণেশ্বরে একদিন নিয়ে যাবার জন্য। ঠাকুর কি তাঁর বাণীর বাহককে চিনতে পেরেছিলেন? নইলে তিনি তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাবার জন্য এত করে বলবেন কেন?

মাস দু'য়েক পরে একদিন দুইজন বন্ধু ও সুরেন্দ্রনাথসহ নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মনে তীব্র জিজ্ঞাসা – ভগবান আছেন কি নেই। যদি থাকেন তাহলে এমন কেউ আছেন কি যিনি তাঁকে দেখেছেন? কারণ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তিনি এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন কিন্তু কোন স্পষ্ট উত্তর পান নি। দক্ষিণেশ্বরের মুখ্যু বামুনের কথা তিনি অনেক শুনেছেন -- রামচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে – রামচন্দ্র দত্ত আবার তাঁদের (নরেন্দ্রনাথের পিতৃগৃহে) বাড়িতেই থাকতেন। এমনকি স্কটিশচার্চ কলেজের অধ্যক্ষ হেষ্টি সাহেবের নিকটও প্রসঙ্গক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনেছেন। সুতরাং হাজির হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে।

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা স্বামীজির জীবনী আলোচনা করছি না। আমাদের বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র। যাই হোক, ঠাকুরের নিজের কথায় নরেন্দ্রনাথকে প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতা এরকম – "দেখিলাম নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য নাই, মাথার চুল ও শরীরের বেশভূষার কোন পারিপাট্য নাই। বাহিরের কোন পদার্থেই ইতরসাধারনের মতো একটা আঁট নাই ; সবই যেন তার আলগা এবং চক্ষু দেখিয়া মনে হইল, তাহার মনের অনেকটা ভিতরের দিকে কে যেন সর্বদা টানিয়া রাখিয়াছে। দেখিয়া মনে হইল, বিষয়ী লোকের আবাস কলিকাতায় এত বড় সত্ত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভব? ...
" গান গাহিবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বাংলা গান তখন সে দুই চারিটি মাত্র শিখিয়াছে; তাহাই গাহিতে বলিলাম। তাহাতে সে ব্রাহ্মসমাজের 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানটি ধরিল এবং ষোল আনা মন প্রাণ ঢালিয়া গাহিতে লাগিল –শুনিয়া আর সামলাইতে পারিলাম না – ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম। ..."[৫] ঐদিন নরেন্দ্রনাথ আরেকটি গান গেয়েছিলেন – " যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে /আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে"

একটু ভাল করে লক্ষ করলে দেখা যায়, এই দুটি গানের মধ্যেই যেন নরেন্দ্রনাথের মনের অবস্থা ও মনুষ্যজীবনের সার্থকতার জন্য গভীর আকুতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

উপরিউক্ত দুটি সাক্ষাৎকারেই নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গান শুনিয়েছেন এবং সে গান শুনে ঠাকুর মুগ্ধ ও ভাবাবিষ্ট হয়েছেন। নরেন্দ্রনাথের গান ঠাকুরের খুবই প্রিয় ছিল। আমরা দেখি যখনই নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে গিয়েছেন, সে দক্ষিণেশ্বরেই হোক বা কোন ভক্তগৃহে, বেশীরভাগ সময়ই তাঁকে ঠাকুরকে গান শোনাতে হয়েছে। সকলেই নরেন্দ্রনাথের গান ভালোবাসতেন।

নরেন্দ্রনাথের গান ও আনন্দের তুফান— নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে এলে যেন উৎসবের পরিবেশ তৈরি হতো। একে তো ঠাকুর উন্মুখ হয়ে থাকতেন কখন নরেন্দ্র আসবে ! নরেন্দ্র

এসে পৌঁছান মাত্র তাঁকে দেখে ঠাকুর সমাধিস্থ হতে। পরে বাহ্য দশায় ফেরত এলে নরেন্দ্রনাথকে একের পর এক গান গাইতে হতো। এ বিষয়ে স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন – " নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে আসিলে আনন্দের তুফান ছুটিত। নরেন্দ্র গানের পর গান গাহিয়া যাইতেন। ঠাকুর সে পবিত্র সুমধুর কণ্ঠে আত্মতত্ত্ব শুনিয়া সমাধিস্থ হইতেন; আবার অর্ধবাহ্যদশাপ্রাপ্ত হইয়া কোন একখানি বিশেষ গান শুনিতে চাহিতেন। সর্বশেষে নরেন্দ্রের মুখে ভক্তিমূলক বা আত্মসমর্পণসূচক 'তুঝসে হামনে দিলকো লাগায়া, যো কুছ হ্যায় সো তুহি হ্যায়' ইত্যাদি বা ঐরূপ কোন গান না শুনিলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না।..."[৬] আমরা কথামৃতে এই বক্তব্যের সমর্থনে অনেক দৃষ্টান্তই খুঁজে পাই।

নরেন্দ্রনাথের গানের ব্যাপকতা – এই প্রসঙ্গে আমরা নরেন্দ্রনাথের গাওয়া গানের বৈচিত্রের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করতে পারি। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু নরেন্দ্রনাথের গানের বৈচিত্র্য সম্পর্কে 'মহাসাগরীয় ঔদার্য' কথাটি ব্যবহার করেছেন। মুলত উত্তর ভারতীয় ঘরানার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গায়ক হয়েও তিনি আশ্চর্য দক্ষতায় ও উদারতায় তিনি সর্বপ্রকার সঙ্গীতের সমাদর করেছেন ও নিজের কণ্ঠে সেগুলি পরিবেশন করেছেন অপূর্ব সুরমাধুর্য সহকারে। তিনি যেমন ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল গেয়েছেন, তেমনি গেয়েছেন টপ্পা, টপ খেয়াল, নানা ধরনের ভজন, শিব সঙ্গীত, শ্যামা সঙ্গীত, কৃষ্ণ সঙ্গীত, বিদ্যাপতি, কবীর, নানক, সুরদাস, তুলসীদাস, তানসেন, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের গান; গিরিশ চন্দ্র ঘোষের লেখা গান এবং সেকালে ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসঙ্গীতও তিনি গেয়েছেন। সেইকালে সদ্য রচিত হওয়া বেশ কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীতও গেয়েছেন তিনি এবং ঠাকুরকে শুনিয়েছেন। গানের ভাষা কখনো সংস্কৃত, কখনো হিন্দি, কখনো বাংলা, কখনো উর্দু বা ফার্সি। এমন উদার বিশ্বতোমুখ গায়ক সচরাচর দেখা যায় না। নির্ভুল ও পূর্ণভাবে শোনানোর জন্যি তিনি তানপুরা যথোচিতভাবে বেঁধে নিতেন আর তবলা বা পাখোয়াজ বাদক থাকলে তো কথাই নেই।

নরেন্দ্রনাথের গান সকলের ভালোলাগার কারণ— শুধু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণই নন, নরেন্দ্রনাথের গান শুনতে সকলেই ভালোবাসতেন। নরেন্দ্রনাথের গান এত ভালোলাগার কারণ হিসেবে আমরা বলতে পারি –

১) নরেন্দ্রনাথ কয়েকজন ওস্তাদের কাছে প্রথামাফিক সঙ্গীত শিক্ষার তালিম নিয়েছেন।
২) নরেন্দ্রনাথের গানের গলা ছিল খুব মিষ্টি --একেবারে ঈশ্বরপ্রদত্ত !
৩) নরেন্দ্রনাথ গান গাওয়ার সময় ত্রুটিহীনভাবে গাইতেন। এবং সেইজন্য তিনি তানপুরা যথোচিতভাবে বেঁধে নিতেন। এছাড়া তবলা, পাখোয়াজ বা মৃদঙ্গে তাঁর সঙ্গে সঙ্গত করার কেউ থাকলে তো কোন কথাই ছিল না। নিদেনপক্ষে একটা তানপুরাও না থাকলে তিনি গান গাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতেন।
৪) নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত চয়ন ছিল অসাধারণ। এছাড়া তাঁর গাওয়া গানগুলির ভাব এবং বিষয়বস্তুর মাধুর্য ও গভীরতা ছিল অতুলনীয়।

৫) গান গাইবার সময় নরেন্দ্রনাথ ষোলআনা মন প্রাণ ঢেলে গান গাইতেন। তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির রসে জারিত হয়ে সঙ্গীতগুলো শ্রোতাদের কানের ভিতর দিয়ে একেবারে মরমে প্রবেশ করত।
৬) সর্বোপরি সেই সময়ের মধ্যেই নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীত বিষয়ে সুপণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন। তার প্রমাণ আমরা পাই এই সময় তাঁর রচিত 'সঙ্গীত কল্পতরু' গ্রন্থ থেকে।

নরেন্দ্রনাথ ও সঙ্গীতবিদ্যা— স্বামীজির মধ্যমভ্রাতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত সঙ্গীতবিদ্যার প্রতি নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি অতি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন—"সঙ্গীতবিদ্যা তাঁহার নিকট চাপল্য বা বালকের খেলা ছিল না। ইহা অতি গম্ভীর ঋষিবিদ্যা। শুদ্ধ পবিত্র জিনিস, ঈশ্বর আরাধনার ও ঈশ্বর উপলব্ধির একটি বিশেষ পবিত্র অঙ্গ। সঙ্গীতকলায় অপবিত্র ভাব ঢুকিলে তাহা নাশ হইয়া যায়। এই বিদ্যাকে অতি শুদ্ধ পবিত্রভাবে রাখিতে হয়, তাহা হইলে ইহা পরিবর্ধিত হয়। নরেন্দ্রনাথ সুর বাঁধিয়া তানপুরায় টান দিয়া যখন ধ্রুপদ গান ধরিতেন তখন তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে পরিণত হইতেন। চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত ও উজ্জ্বল, দৃষ্টি স্থির এবং অলক্ষিতভাবে লক্ষ্য করিতেছেন এরূপ গভীর তেজঃপুঞ্জ, পরিমিত স্পন্দনযুক্ত শব্দ তাঁহার কণ্ঠ হইতে বহির্গত হইত, তাঁহার মুখ তখন মহাতেজোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত এবং অবয়ব অতি গম্ভীর ও স্থির হইয়া যাইত। নিজের মুখে কোন চাপল্যের ভাব নাই এবং উপস্থিত ব্যক্তিদেরও চাপল্য করিবার কোন সামর্থ্য থাকিত না। ঈশ্বর উপাসনা সঙ্গীতের উদ্দেশ্য, -- শব্দ থেকেই নাদে যাওয়া সঙ্গীতের উদ্দেশ্য, নাদই ব্রহ্ম এবং নাদ বা স্পন্দন হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে – এই সত্য প্রকাশ করাই সঙ্গীতের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেইজন্য নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতকালে এত গম্ভীর বা তেজঃপূর্ণ হইয়া উঠিতেন। সেই সময়টা গৃহাভ্যন্তরে বায়ু দোদুল্যমান হইত। শক্তি যেন সর্বত্র পরিব্যপ্ত হইত এবং উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মনও যেন ঐ শক্তির সঙ্গে মিলিত হইয়া কোথায় ঊর্ধ্বে চলিয়া যাইত। ধ্যান আপনা আপনি যেন সকলের মধ্যে আসিতে থাকিত।..."[৭] মহেন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন যে , বলরামবাবুর বাড়িতে কখনো কখনো নরেন্দ্রনাথ সন্ধ্যার সময় ভজন গাইতেন – তখন তানপুরায় সুর বাঁধতেন, তারগুলি টং টং করে বাজাতেন, আবার বাঁয়াতবলায় টোকা দিতেন, সব সুর ঠিক হ'ল কিনা দেখতেন। সেইসময় তিনি এত গম্ভীর হ'তেন ও এত নিবিষ্টমনে সুরের দিকে লক্ষ্য রাখতেন যে, আগন্তুক ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি কেউ সামান্যতম আওয়াজ করত তাহলেও তিনি বিষম বিরক্ত হ'তেন।[৮]

সহপাঠীকে গান শোনানো— নরেন্দ্রনাথের বন্ধুরাও তাঁর গান শুনতে ভীষণ ভালোবাসতেন। হয়তো কোনদিন নরেন্দ্রনাথ পাঠে মনোনিবেশ করেছেন, এমন সময় তাঁর কোন বন্ধু এসে হাজির! তখন বেলা এগারোটা। প্রিয়নাথ সিংহ লিখেছেন – "বন্ধু এসে নরেনকে বললেন, "ভাই রাত্তিরে পড়িস, এখন দুটো গান গা।" অমনি নরেন পড়বার বই মুড়ে একধারে ঠেলে রাখলেন। তানপুরার জুড়ির তার ছিঁড়ে গেছে। সে তারের সুর বেঁধে নরেন গান ধরবার আগে বন্ধুকে বললেন, "তবে বাঁয়াটা নে।" বন্ধু বললেন, "ভাই আমি

তো বাজাতে জানি না। ইস্কুলে তেবিল চাপড়ে বাজাই বলে কি তোমার সঙ্গে বাঁয়া বাজাতে পারব?" অমনি নরেন আপনি একটু বাজিয়ে দেখালেন বললেন, "বেশ করে দেখে নে দেখিনি। পারবি বই কি, কেন পারবি নি? কিছু শক্ত কাজ নয়। এমনি করে কেবল ঠেকা দিয়ে যা, তাহলেই হবে।" সঙ্গে সঙ্গে বাজনার বোলটাও বলে দিলেন। বন্ধু দু'একবার চেষ্টা করে কোনরকমে ঠেকা দিতে লাগলেন, গান চলল। টপ্পা, টপ্ খেয়াল, খেয়াল, ধ্রুপদ, বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত। নূতন ঠেকার সময় নরেন এমনি সহজভাবে বোলসহ ঠেকাটি দেখিয়ে দেঞ্জে, একদিনেই কাওয়ালি, একতাল, আড়াঠেকা , মধ্যমান, এমনকি সুরফাঁক তাল পর্যন্ত তার দ্বারা বাজিয়ে নিলেন। বন্ধু মাঝে মাঝে তামাক সেজে নরেনকে খাওয়াচ্ছেন ও নিজে খাচ্ছেন; সেটা কেবল বাজানো থেকে একটু অবসর না নিলে হাত যে যায়! নরেন্দ্রে কিন্তু গানের কামাই নেই, হিন্দি গান হলে নরেন তার মানে বলছেন ও তার অন্তর্নিহিত ভাবতরঙ্গের সঙ্গে সুর লয়ে অপূর্ব ঐক্য দেখিয়ে বন্ধুকে বিমোহিত করছেন। দিন কোথা দিয়ে চলে গেল। সন্ধ্যা এলো। বাড়ির চাকর এসে একটি মিটমিটে প্রদীপ দিয়ে গেল। ক্রমে রাত্রি দশটার সময় দু'জনের হুঁশ হলে সেদিনকার মতো পরস্পর বিদায় নিয়ে নরেন্দ্র পিত্রালয়ে ভজনের জন্য গেলেন, বন্ধু স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।[৯]

'জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই'— এইরকম সঙ্গীতচর্চাও নরেন্দ্রনাথে প্রাণে কিন্তু সেইসময় শান্তি এনে দিতে পারেনি। কারণ তিনি সেইসময় ঈশ্বরসত্য লাভের জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। জগতের চরম সত্যকে সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু কেউ তাঁকে সন্ধান দিতে পারছেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁর ঈশ্বর দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা ও তপস্যা আরও বেড়ে গিয়েছিল। এইসময় ঠাকুরের ভক্ত তথা বাংলার বিখ্যাত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচনা করেন 'বুদ্ধচরিত' নামে একটি বিখ্যাত নাটক। তাতে একটি গান ছিল, 'জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই'। গানটি নরেন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। স্বামীজির মধ্যম ভ্রাতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, " নরেন্দ্র যখন এই গানটি গভীর রাত্রিতে শয্যাত্যাগ করিয়া সিমলার গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীটস্থ বাড়ির দালানে আপনার মনে পায়চারি করিতে করিতে গাহিতেন তখন তাঁহার মুখ হইতে এমন শ্রুতিমধুর হইত যে বাড়ির আশে পাশের ঘরের নিদ্রিত ব্যক্তিরা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্থির হইয়া শুনিতেন। সুর তাল রাগের কোথা নহে কিন্তু ভিতরের প্রাণ হইতে ঠিক নিজের অবস্থাটা প্রকাশ করিয়া তিনি জীবন্তভাবে গানটি গাহিতেন। যাঁহারা নরেন্দ্রনাথের মুখে রাত্রিতে সেই গান শুনিতেন তাঁহাদের তখন আর বাহ্যজ্ঞান কিছু থাকিত না – সংসারের মায়া মমতা ভুলিয়া গিয়া কোথায় এক অসীম জগতে প্রবেশ করিতেন।..."[১০]

'চৈতন্যলীলা' ও সঙ্গীতের ভাবরাজ্যে নরেন্দ্রনাথ— এই সময়ে গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' নাটকের অভিনয় খুব চলছিল। নরেন্দ্রনাথ এই নাটকের কয়েকটি গান খুব পছন্দ করতেন এবং মাঝে মাঝেই সেগুলি গাইতেন। ঈশ্বরের প্রতি তীব্র ব্যাকুলতার কথা থাকায় এবং তাঁর নিজের মনের অবস্থার অনুরূপ হওয়ায় গানগুলি নরেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় হয়েছিল

এবং তিনি নিজের অনুভূতি মিশিয়ে সেগুলি সময়ে সময়ে গাইতেন। মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন –" সেই সময় নরেন্দ্রনাথ চৈতন্যলীলার গান গাহিতেনঃ রাধা বই আর নাইকো আমার / রাধা বলে বাজাই বাঁশি/ মানের দায়ে সেজে যোগী / মেখেছি গায় ভস্মরাশি । ... রাত্রে বাড়িতে নরেন্দ্রনাথ এই গানটি প্রাণের ভিতর থেকে নিজেদের অবস্থা প্রতিবিম্বিত হইতেছে, সে উল্লেখ করিয়া অতি মধুর করুণ স্বরে গাহিতেন। গানের প্রত্যেক ভাব প্রত্যেকটি শব্দ শ্রোতার গাত্র বিদ্ধ করিয়া অন্তর পর্যন্ত প্রবেশ করিত। যথার্থই তো গায়ে ভস্ম মেখে নগ্ন পদে ভিক্ষুক হইয়া ভগবানলাভের জন্য পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন। সেইজন্য এই গানটি সেই সময়ের উপযোগী হওয়ায় লোকের পক্ষে বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।...

"নরেন্দ্রনাথ আরেকটি চৈতন্য বিষয়ক গান গাহিতেন। এবং তাঁহার দুই চক্ষে অনবরত অশ্রু বিগলিত হইত "তুমি দ্বারে দ্বারে নাকি কেঁদেছ

কত পাষণ্ড তনয় কত কথা কয়

তবু নাকি প্রেম যেচেছ...

"নরেন্দ্রনাথ এই ভাবটি জীবনের সাধনার অঙ্গ করিয়া লইয়াছিলেন।... এইজন্য যখন এই দুই কলি গাহিতেন, নিজের অবস্থা ও জীবনের উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিতেন।"[১১]

নরেন্দ্রনাথের মা কালীকে মানা ও শ্যামাসঙ্গীত গাওয়ার সূত্রপাত– নরেন্দ্রনাথ প্রথম প্রথম মা কালীকে বা অন্য কোন সাকার দেবদেবী মানতেন না। ঠাকুর কখনও তাঁর সামনে যদি বলতেন, " মা আমাকে এরকমই দেখিয়ে দিয়েছেন।" তখন নরেন্দ্রনাথ বলে উঠেছেন, " মা এরকম বলেছেন, না আপন মাথার খেয়ালে দেখেছেন কে জানে!" এ হেন নরেন্দ্রনাথ পিতৃবিয়োগের পর সাংসারিক বিপর্যয়ে প্রবল চেষ্টা করেও কোন কূলকিনারা না দেখতে পেয়ে অবশেষে একদিন ঠাকুরের কাছে গেলেন যাতে ঠাকুর তাঁর মা ভাই বোনেদের দুঃখের কথা ভগবানকে জানান। কিন্তু ঠাকুর নরেনকেই সেদিন মা কালীর কাছে পাঠান সাহায্য প্রার্থনার জন্য। বলেন, "আজ মঙ্গলবার। আজ রাত্রে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা চাইবি, মা তোকে তাই দিবেন।..." অবশেষে গভীর রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে নরেন্দ্রনাথ গেলেন মা কালীর মন্দিরে। মাকে সামনে পেয়ে তাঁর মনে হল, মা সত্য সত্যই চিন্ময়ী। কিন্তু তিনি সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্তে চেয়ে বসলেন বিবেক ,বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি এইসব। বার বার তিনবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। তখন তাঁর অনুরোধে ঠাকুরই বলেন, "আচ্ছা যা, তাদের মোটা ভাত কাপড়ের কখনো অভাব হবে না।"

এই ঘটনার পর থেকে নরেন্দ্রনাথের মনে এক অপুর্ব ভক্তিধারা প্রবাহিত হতে থাকে। মন্দির থেকে ফিরেই তিনি ঠাকুরকে বলেন, মায়ের গান শিখিয়ে দিন। ঠাকুর তাঁকে 'মা ত্বং হি তারা' গানটি শিখিয়ে দিলে নরেন্দ্রনাথ সমস্ত রাত্রি জেগে ঐ গানটি গেয়েছিলেন। ঠাকুর এই ঘটনায় অতিশয় সন্তুষ্ট হন এবং ভক্তদের কাছে আনন্দ প্রকাশপূর্বক ঘটনাটি বারে বারে বলতে থাকেন। এরপর থেকে নরেন্দ্রনাথ শ্যামাসংগীত গাওয়া আরম্ভ করেন।[১২]

“ওরে তোর গান অনেকদিন শুনিনি, গান গা”— ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কত তীব্র ভালোবাসতেন ও তাঁর গান কত সতৃষ্ণভাবে শুনতে চাইতেন, তাঁর একটি চমৎকার চিত্র পাওয়া যায় প্রিয়নাথ সিংহের স্মৃতিকথা থেকে – “একদিন সকালে রামকৃষ্ণদেব , নরেন অনেকদিন তাঁর কাছে না যাওয়ায় তাঁকে দেখবার জন্য রামলালের সঙ্গে কলকাতায় নরেনের ‘টঙে’ আগমন করেন। সেদিন সকালে নরেনের ঘরে দুই সহপাঠী বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও দাশরথি সান্ন্যাল বসে কখনও পাঠ করছেন, আবার কখনও বা কথাবার্তা বলছেন। এমন সময় বহির্দ্বারে ‘নরেন’ ‘নরেন’ শব্দ শোনা গেল। স্বর শুনেই নরেন অতীব ব্যস্ত হয়ে দ্রুত নীচে চলে গেলেন। তাঁর বন্ধুরাও বুঝলেন পরমহংসদেব এসেছেন, তাই নরেন এত ব্যস্ত হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনতে গেলেন। বন্ধুরা দেখলেন, সিঁড়ির মাঝখানেই পরস্পরের সাক্ষাৎ হল। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে দেখেই অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ গদ সবরে বলতে লাগলেন, “তুই এতদিন যাসনি কেন?” “ তুই এতদিন যাসনি কেন?” বারংবার এই বলতে বলতে ঘরে এসে বসলেন। পড়ে গামছায় বাঁধা সন্দেশ খুলে নরেনকে ‘খা’ ‘খা’ বলে খাওয়াতে লাগলেন। নরেন একলা খাবার পাত্র নয়, তা থেকে কতকগুলি সন্দেশ নিয়ে আগে তাঁর বন্ধুদের দিয়ে তবে খেলেন। রামকৃষ্ণ তারপরে বললেন, “ওরে, তোর গান অনেকদিন শুনি নি, গান গা।” অমনি তানপুরা নিয়ে তার কান মলে সুর বেঁধে নরেন্দ্র গান আরম্ভ করলেন – “জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী”। গানও আরম্ভ হল,শ্রীরামকৃষ্ণও ভাবস্থ্ হতে লাগলেন। গানের স্তরে স্তরে মন ঊর্ধ্বে উঠল, চক্ষে পলক নেই, মুখাবয়ব অমানুষী ভাব ধারণ করল, ক্রমে মর্মর মূর্তির মতো নিস্পন্দ হয়ে নির্বিকল্প সমাধিস্থ্ হলেন। নরেনের বন্ধুরা পূর্বে কোন মানুষের এরূপ দেখেন নি। তারা এই ব্যাপার দেখে মনে করলেন বুঝি বা তিনি শরীরে সহসা কোন পীড়া হয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। তাঁরা মহা ভীত হলেন। দাশরথি তাড়াতাড়ি জল এনে তাঁর মুখে সিঞ্চন করবার উদ্যোগ করছেন দেখে নরেন্দ্র তাঁকে বারণ করে বললেন, “জল দেবার দরকার নেই, উনি অজ্ঞান হন নি, ওঁর ভাব হয়েছে। আবার গান শুনতে শুনতেই জ্ঞান হবে। নরেন্দ্র এইবার শ্যামা বিষয়ক গান ধরলেন, “একবার তেমনি তেমনি করে নাচ মা শ্যামা” শ্যামাবিষয়ক গান আনেক হল, কৃষ্ণবিষয়ক গানও অনেক হল। গান শুনতে রামকৃষ্ণ কখনো ভাবাবিষ্ট হচ্ছেন, আবার কখনও বা সহজাবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছেন। নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরে গান গাইলেন। অবশেষে গান শেষ হলে রামকৃষ্ণ বললেন, “ দক্ষিণেশ্বরে যাবি? ক’দিন তো যাস নি। চল না আবার এখনি ফিরে আসিস। নরেন্দ্র তখনই সম্মত হলেন এবং পুস্তকাদি যেমন পড়েছিল তেমনিই রইল কেবল তানপুরাটি সযত্নে তুলে রেখে গুরুদেবের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গমন করলেন।...”[১৩]

নরেন্দ্রের কীর্তন ও ঠাকুরের আনন্দ— নরেন্দ্র গান বা কীর্তন গাইলে কীরকম আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হতো এমনই একটি বিবরণ রামকৃষ্ণ কথামৃতে আছে। ১৮৮২ খ্রি. অক্টোবর মাসের কোন একদিনের ঘটনা। অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথের তখন মাত্র সাড়ে আঠারো বছর বয়েস। ঐদিন বিকেলে নরেন্দ্রনাথ একের পর এক কীর্তন গাইছেন – ১) চিন্তয় মম মানস

হরি চিদঘন নিরঞ্জন, ২) সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদি মন্দিরে, ৩) আনন্দ বদনে বল মধুর ব্রহ্ম নাম। খোল করতাল নিয়ে গাইতে গাইতে নরেন্দ্রাদি ভক্তরা ঠাকুরকে মাঝে রেখে ঘুরে ঘুরে কীর্তন করছেন। শেষে নরেন্দ্র নিজে খোল ধরে মত্ত হয়ে ঠাকুরের সঙ্গে গাইছেন, " আনন্দ বদনে বল মধুর হরিনাম।" কীর্তন শেষে "ঠাকুর নরেন্দ্রকে অনেকক্ষণ ধরিয়া বারবার আলিঙ্গন করিলেন ! বলিতেছেন, " তুমি আজ আমায় যে আনন্দ দিলে !!!"[১৪]

"আগুন জ্বেলে গেছে, এখন থাকল আর গেল!"— নরেন্দ্রনাথের গান সকলের নিকটই পরম আদরের বস্তু। তাই আমরা কথামৃতে বারে বারে দেখতে পাই, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রের গান শোনার জন্য ব্যাকুল! নরেন্দ্রের একটু আধটু শরীর খারাপে পর্যন্ত নিস্তার নেই! " নরেন্দ্রের শরীর তত সুস্থ নয়, কিন্তু তাঁহার গান শুনিতে ঠাকুরের ভারী ইচ্ছা। তিনি বলিতেছেন, "নরেন্দ্র, এরা বলছে একটু গা না।" অমনি নরেন্দ্র তানপুরা নিয়ে গানে প্রবৃত্ত হলেন।[১৫] দক্ষিণেশ্বরে একদিন নরেন্দ্র গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিমগ্ন হয়েছেন, সঙ্গীত সমাপনান্তে ঠাকুরকে সমাধিস্থ দেখে নরেন্দ্র নীরবে পূর্বদিকের বারান্দায় চলে গেছেন। সমাধিভঙ্গের পর এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখেন যে নরেন্দ্র ঘরে নেই, কেবল তানপুরাটি পড়ে রয়েছে। অথচ নরেন্দ্রের গানের রেশ তখনও ভক্তদের মনে রয়ে গেছে! তখন ঠাকুর নরেন্দ্র ও তাঁর গান সম্পর্কে ভক্তদের বলছেন, "আগুন জ্বেলে গেছে, এখন থাকল আর গেল!"[১৬]

"আহা, নরেন্দ্রের কী গান !"— আরেকদিনের কথা। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে অনেক ভক্তই উপস্থিত হয়েছেন। নরেন্দ্রও উপস্থিত আছেন। খানিক কীর্তন ইত্যাদির পরে ঠাকুর নরেন্দ্রকে গাইতে বললেন। ঐদিন অপরাহ্নে আবার নরেন্দ্রের গান হবে। নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরে তানপুরার সুর বাঁধছেন। ঠাকুর ও ভক্তরা নরেন্দ্রের গান শোনার জন্য অধৈর্য হচ্ছেন। কেউ কেউ অধৈর্য হয়ে বলছেন, "তানপুরা আজ বাঁধা হবে, গান অন্য একদিন হবে।" ঠাকুর অধৈর্য হয়ে বলছেন, "এমনি ইচ্ছে হচ্ছে যে তানপুরাটি ভেঙে ফেলি। কি টং টং – আবার তানা নানা নেরে নুম হবে ! ..."

এরপর নরেন্দ্র গান আরম্ভ করলে সকলেই মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকেন। ঠাকুর ছোটো খাটটিতে বসেই শুনতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরেই ভাবাবিষ্ট অবস্থায় নীচে নেমে নরেন্দ্রের কাছে এসে বসলেন। এইদিন নরেন্দ্রের গাওয়া গানের মধ্যে একটি ছিল – "নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপ রাশি"। গান গেয়ে উৎসবান্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন, কিন্তু সবার মনে --এমনকি ঠাকুরের মনেও নরেন্দ্রের গানের আবেশ রয়ে গেছে। মন্দিরে আরতির পরে মাস্টার ঠাকুরকে প্রণাম করতে গেলে ঠাকুর মাস্টারকে সম্বোধন করে বলছেন, " আহা, নরেন্দ্রের কি গান! ... আমার মনটা এখনও যেন টেনে রেখেছে।..."[১৭] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, ঠাকুরের মতই মা সারদাও নরেন্দ্রের গান শুনতে ভীষণ ভালোবাসতেন । মাঝে মাঝে তিনি মাকে ভক্তিমূলক গান শোনাতেন। মা বলতেন,

"নরেনের কি পঞ্চমেই সুর ছিল! আমেরিকা যাবার আগে আমাকে গান শুনিয়ে গেল ঘুসুরির বাড়িতে।..."[১৮]

ডাক্তারের ভজন শোনা— বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একসময় শ্রীরামকৃষ্ণের গলদেশের ক্যান্সার চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এই উপলক্ষেই তিনি রামকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তমণ্ডলীর সান্নিধ্যে আসেন। এইসময় তিনি নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে একদিন নিজের গৃহে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান। তিনি সেদিন নরেন্দ্রের গান শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করলে নরেন্দ্র একদিন ঠাকুরের সকাশে তা শোনাবেন বলেন। এর কিছুদিন পরে ডাক্তারবাবু ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য এলে প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য নরেন্দ্রনাথ দুই-তিনঘণ্টা ধ'রে তাঁকে ভজন শুনিয়েছিলেন। " ডাক্তার শুনিয়া এত প্রীত হইয়াছিলেন যে, বিদায় গ্রহণকালে গায়ককে আদর ও চুম্বন করিয়া ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, "এর মতো ছেলে ধর্মলাভ করিতে আসিয়াছে দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত; এ একটি রত্ন, যাতে হাত দিবে সেই বিষয়েই উন্নতিসাধন করিবে।" ঠাকুর তদুত্তরে নরেন্দ্রের প্রতি স্নেহদৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিয়াছিলেন, "কথায় বলে ,অদ্বৈতের হুঙ্কারেই গৌর নদীয়ায় আসিয়াছিলেন। সেইরূপ ওর জন্যই তো এবার সব গো!" অতঃপর ডাক্তারবাবু শ্যামপুকুরে আসিয়া যখনই নরেন্দ্রকে কাছে পাইতেন, তাঁহার মুখে দুই-একটি ভজন না শুনিয়া বাড়ি ফিরিতেন না।"[১৯]

নরেন্দ্রনাথের গানের ফলে সৃষ্ট অপার্থিব পরিবেশ— শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে চিকিৎসাধীন ঠাকুরকে গান শুনানো নরেন্দ্রনাথের একটা নিত্য কর্তব্যের মতো হয়ে গিয়েছিল। আর সে কী গান! কখনো কখনো নরেন্দ্রের গানের পরে একটা অপার্থিব পরিবেশ তৈরি হতো। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আগত ডাক্তার পর্যন্ত সে গান শুনে মুগ্ধ ও আবিষ্ট হয়ে যেতেন। এমনই একদিনের বিবরণ পাই কথামৃতে । ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সেদিন গান শুনতে চাইলে ঠাকুর নরেন্দ্রকে অনুরোধ করেন গান গাইতে। নরেন্দ্র তানপুরা সহযোগে গান আরম্ভ করেন। প্রথমে গান – 'সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে।' অতঃপর ' আমায় দে মা পাগল করে'। কথামৃত গ্রন্থে তারপরের বিবরণ –
" গানের পর অদ্ভুত দৃশ্য। সকলেই ভাবে উন্মত্ত। পণ্ডিত পান্ডিত্যাভিমান ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বলছেন, " আমায় দে মা পাগল করে, আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে।" বিজয় সর্বপ্রথম আসন ত্যাগ করিয়া ভাবোন্মত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুর দেহের কঠিন অসাধ্য ব্যাধি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার সম্মুখে। তিনিও দাঁড়াইয়াছেন। রোগীরও হুঁশ নাই। ছোটো নরেনেরও ভাব সমাধি হইল। লাটুরও ভাবসমাধি হইল। ডাক্তার সায়েন্স পড়িয়াছেন, কিন্তু অবাক হইয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, যাঁহাদের ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের বাহ্য চৈতন্য কিছুই নাই, সকলেই স্থির, নিস্পন্দ; ভাব উপশম হইলে কেহ কাঁদিতেছেন, কেহ কেহ হাসিতেছেন। যেন কতকগুলি মাতাল একত্র হইয়াছে।"[২০]

গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল' দেখতে গিয়ে নরেন্দ্রনাথের গান— স্বামীজির মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত নরেন্দ্রনাথের গান প্রসঙ্গে বেশ একটি অসাধারণ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন – "এইসময় গিরিশবাবুর 'বিল্বমঙ্গল' অভিনয় হয়। সম্ভবতঃ গিরিশবাবু নরেন্দ্রনাথকে 'বিল্বমঙ্গল' অভিনয় দেখাইবার জন্য লইয়া যান। অভিনয় সমাপ্ত হইলে পর দর্শকবৃন্দ সকলে চলিয়া গেলে, গিরিশবাবু নরেন্দ্রনাথকে লইয়া রঙ্গমঞ্চে ঢুকিলেন। তখন ভিড় নাই – সকলেই একটু নিরিবিলি কথাবার্তা কহিতেছেন, নর্তক নর্তকীগণ চারিদিকে দণ্ডায়মান আছে, এমন সময় নরেন্দ্রনাথ তথায় উপস্থিত হইলেন। নর্তক ও নর্তকীগণ মৌখিক সম্মান প্রদর্শন করিয়া দূরে দণ্ডায়মান রহিল এবং আপনা আপনি কথা কহিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চে বসিয়া একটি তানপুরা লইয়া স্থিরভাবে ভজন গাহিতে আরম্ভ করিলেন। স্বভাবসিদ্ধ একাগ্রতায় গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হওয়ায় তাঁহার শক্তি জাগিয়া উঠিল। চক্ষু নিমীলিত, কণ্ঠ হইতে ভক্তিপুর্ণ স্বর উঠিতেছে এবং দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। ঠিক যেন নরেন্দ্রনাথ নিজের ইষ্টকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া সুস্বরে আহ্বান করিতেছেন। স্থানটি নর্তকাগার হইতে দেবমন্দিরে পরিণত হইল, ভক্তি ও ঈশ্বরানুরাগ যেন চতুর্দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। বায়ু যেন ধর্ম পবিত্রতা ও ঈশ্বরানুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। চপলস্বভাব নর্তকীবৃন্দ তখন ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং কাহার সম্মুখে তাহারা চাপল্যভাব প্রকাশ করিয়াছিল, এই চিন্তায় তাহারা কম্পিত ও ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং ভীতু উদ্বিগ্ন হইয়া করজোড়ে অতি বিনীতভাবে দূরে দণ্ডায়মান রহিল। গিরিশবাবু তখন নরেন্দ্রনাথের ধ্যান ও গভীর চিন্তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া একটু চিন্তিত ও উন্মনা হইলেন এবং ঐরূপ ভাব আর যাহাতে পরিবর্ধিত হইতে না পারে এই উদ্দেশ্যে তিনি নরেন্দ্রনাথের হাত হইতে তানপুরা উঠাইয়া লইলেন এবং নরেন্দ্রনাথের হস্তধারণ করিয়া মঞ্চ হইতে বাহির হইয়া নিজের গাড়িতে বসাইলেন এবং বাগবাজারে আনিলেন।"[২১]

"দাদাঠাকুর, এমন মধুর হরিনাম কখনও শুনিনি"— ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ লোকান্তরিত হবার পর নরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর আরও কয়েকজন যুবক গুরুভ্রাতা আর সংসারে ফিরে না গিয়ে বরাহনগরে একটি অতি জীর্ণ ভূতুরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে মঠ স্থাপন করেন। তখন প্রবল কষ্টের দিন। পরনের কাপড় নেই , খাবার দাবার বেশিরভাগ দিনই প্রায় কিছু জুটত না। সেখানেও নরেন্দ্রনাথ মাঝে মধ্যেই কীর্তনানন্দে মেতে উঠতেন। অশ্রুধারায় বুক ভেসে যেত। বহু মানুষ সেখানে সমবেত হয়ে যেত সে মধুর কীর্তন শোনার জন্য। কোন কোনদিন টানা ঘণ্টাচারেক কীর্তনের পর থামতেন। সমাগত মানুষজন তখন বলতেন, "দাদাঠাকুর এমন কীর্তন কখনও শুনিনি, এমন মধুর হরিনাম কখনও শুনিনি।"[২২]

"এলো না এলো না শ্যাম, কুঞ্জে তো এলো না"— নরেন্দ্রনাথ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, সেই সময় তাঁকে যারা জানতেন, তাঁরা কেউ কেউ খুবই আফশোস করেছিলেন, "তাই তো হে, নরেন্দ্র পাগল হয়ে বেরিয়ে গেল ! এমন গানটা মাটি করে গেল ; এত বছর

গানটা শিখে গলা সেধে সব মাঠে মারা গেল !" কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তো ওস্তাদ বা নামজাদা সঙ্গীতশিল্পী হবার জন্য গান শেখেন নি। গানকে তিনি তাঁর অন্যতম সাধন বা উপাসনা পদ্ধতি বলে মনে করতেন। পরিব্রাজক জীবনে বারে বারে দেখা গেছে যে তিনি যেখানেই যেতেন, কেউ অনুরোধ করলে তিনি গান শোনাতে দ্বিধা করতেন না। একদিকে যেমন এর মাধ্যমে ভগবানকে ডাকার ও চেতনা জাগরণের সুযোগ পাওয়া যায়, তেমনি সঙ্গীতের ক্ষমতা আছে মানুষের হৃদয়ে ধাক্কা দেবার, যেটা হাজার হাজার উপদেশ ও বক্তৃতায় সম্ভব নাও হতে পারে। তিনি যে কত উঁচুদরের গায়ক এবং সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, সেটা তাঁর যেকোনো জীবনীগ্রন্থ পড়লেই তার ভুরি ভুরি নিদর্শন পাওয়া যায়। এমনই একটি স্মৃতিচারণ করেছেন শ্রী মন্মথ চৌধুরী মহাশয় ।

স্বামীজি তখন পরিব্রাজক অবস্থায় ভাগলপুরে গিয়েছেন। মন্মথবাবু লিখেছেন– "...একদিন দেখিলাম, তিনি আপন মনে গুন গুন করিয়া গান গাহিতেছেন; তাই জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি গান গাহিতে জানেন কিনা। তিনি উত্তর দিলেন, 'খুব সামান্যই।" আমাদের পীড়াপীড়িতে তিনি গান গাহিতে রাজী হইলেন। তখন আশ্চর্যান্বিত হইয়া দেখিলাম, পাণ্ডিত্যে যেমন, সঙ্গীতেও তিনি তেমনি পারদর্শী। পরদিন জানিতে চাহিলাম, আমি যদি জনকয়েক গায়ক ও বাদককে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসি তবে তাঁহার আপত্তি আছে কিনা। তিনি সম্মত হইলেন এবং আমি অনেক গায়ককে ডাকিয়া আনিলাম ; তাঁহাদের মধ্যে অনেক ওস্তাদও ছিলেন। ভাবিয়াছিলাম রাত্রি নয়টা দশটার মধ্যেই গানের আসর ভাঙিয়া যাইবে। এদিকে স্বামীজি রাত্রি দুইটা-তিনটা পর্যন্ত অবিরাম গান গাহিয়া চলিলেন। সকলেই গানে এত মাতিয়া গিয়াছিলেন যে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা সময়ের জ্ঞান ছিল না। কেহই আসন ত্যাগ করিলেন না বা বাড়ি ফিরিবার কথা ভাবিলেন না। কৈলাসবাবু সঙ্গত করিতেছিলেন; কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া থামিতে হইল; কারণ তাঁহার আঙুল অসাড় ও অচল হইয়া গিয়াছিল। এরূপ অলৌকিক শক্তি আমি আর কখনও দেখি নাই, ভবিষ্যতেও দেখার আশা রাখি না। ..."

পূর্বেই বলেছি, মানুষের জীবনে সঙ্গীতের প্রভাব অপরিসীম। মুহূর্তের মধ্যে মানুষের মনোজগতে অভাবনীয় পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে সঙ্গীত, বিশেষত যদি গায়ক হন স্বামী বিবেকানন্দের মতো কেউ! মন্মথবাবু পূর্বে ব্রাহ্ম মতে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু স্বামীজির সাথে আলাপ পরিচয়ের পর এবং স্বামীজির গান শোনার পর তিনি আবার হিন্দুমতেই প্রত্যাবর্তন করেন। "স্বামী অখণ্ডানন্দ" গ্রন্থের মতে স্বামীজি মন্মথবাবুর বাড়িতে প্রথম দিন গানের মজলিসে যে সমস্ত গান গেয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি ছিল—"এলো না এলো না শ্যাম, কুঞ্জে তো এলো না/ রজনী পোহায়ে যায় তবুও সে এলো না।[২৩]

"যোগিনীর বেশে, যাবো সেই দেশে যেথায় নিঠুর হরি"— রাজস্থান বৈষ্ণবপ্রধান স্থান। এখানকার ধর্মীয় জীবনে রাধাকৃষ্ণের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। পরিব্রাজক জীবনে স্বামীজি যখন রাজস্থানে উপনীত হন, তখন সেখানকার মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী স্বামীজি কৃষ্ণের প্রসঙ্গ আলোচনা করতেন এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, সুরদাস প্রমুখের কীর্তন ও ভজন গান

গাইতেন ও মানুষের মনে অনপনেয় প্রভাব সৃষ্টি করতেন। মানুষ ভাবতন্ময় হয়ে সেগুলি শুনত ও ভক্তিরসে প্লাবিত হতো এবং তাঁদের মনে আধ্যাত্মিকতার প্রতি আগ্রহ জাগরিত হতো। স্বামীজি যখন বাংলা গান বা কীর্তন গাইতেন তার আগে হিন্দিতে অনুবাদ করে তার অর্থ সকলকে বুঝিয়ে দিতেন। কেউ কেউ আবার তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে কীর্তনে মত্ত হতেন। অনেকে আবার ভুলে যাবার ভয়ে গানগুলি লিখে রাখতেন। কখনও কখনও গান বা কীর্তন এত দিব্য পরিবেশ সৃষ্টি করত যে, মানুষের কোনো ইহজাগতিক হুঁশই থাকত না। হয়তো সমস্ত রাত্রিই এতে অতিবাহিত হল! এরকম একদিনের কথা বর্ণনা করেছেন স্বামী গম্ভীরানন্দ –

"একদিন তিনি গাহিলেন –

'আমি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিয়ে
শঙ্খের কুন্তল পরি।
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে
যেথায় নিঠুর হরি।।
আমি মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিব যোগিনী হয়ে,
যদি কোন ঘরে মিলে প্রাণবধু
বাঁধিব অঞ্চল দিয়ে।...'

ভাবে গদগদ কণ্ঠে গাহিতে গাহিতে স্বামীজির চক্ষে অশ্রুধারা দেখা দিল, সেই মহাপুরুষের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি সমপ্রাণ ভক্তদেরও গণ্ড বাহিয়া নয়নবারি প্রবাহিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ ভাবিতে লাগিলেন, "বাবাজী নিশ্চয়ই বৃন্দাবনচন্দ্রের দর্শন পেয়েছেন, তাই এত প্রেমবিভোর, নতুবা আমরাও তো তাঁকে ডাকি, কিন্তু কই আমাদের তো এরূপ তন্ময়তা আসে না।" কেহবা ভাবিলেন, "এতো সব ঈশ্বরেরই বিভূতি! ইনি নিশ্চয়ই ঈশ্বরলাভ করেছেন।" সেদিন গাহিতে গাহিতে স্বামীজির কণ্ঠস্বর ক্রমে করুণ হইতে করুণতর হইয়া অবশেষে হৃদয়ের আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ ও দেহ প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া গেল এবং মুখশ্রী প্রাণবঁধুর স্পর্শবিহ্বলা ও উৎফুল্লমুখী গোপিকার ন্যায় প্রেমরাগে রঞ্জিত হইয়া দিব্য মাধুর্য ধারণ করিল।"[২৪]

পাশ্চাত্য শিষ্যাদের গান শোনানো— স্বামীজি তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্য-শিষ্যাদেরও ভারতীয় গান শোনাতেন। নিবেদিতা, ওলি বুল, জোসেফাইন ম্যাকলাউড প্রমুখকে নিয়ে স্বামীজি উত্তর ভারত ভ্রমণ করার সময় দিনের পর দিন ভারতীয় গান শুনিয়েছেন, যার মধ্যে কীর্তন, রামপ্রসাদসহ অন্যান্য শ্যামাসংগীত, মীরার ভজন, সুরদাসের ভজন ইত্যাদি। তবে ভারতীয় গান শোনানোর সময় তিনি ইংরেজি অনুবাদ করে গানটির অর্থ সবাইকে বুঝিয়ে দিতেন। এ বিষয়ে প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে ভগিনী নিবেদিতার লেখা 'স্বামীজির সহিত হিমালয়ে' গ্রন্থে।[২৫]

সঙ্গীত বিষয়ে স্বামীজির বক্তব্য— স্বামীজি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ধরণের সঙ্গীত সম্পর্কেই বেশ গভীর আলোচনা করেছেন। পরিব্রাজক অবস্থায় তাঁর কাছে ফরাসি সঙ্গীতের বই দেখা গেছে। প্রিয়নাথ সিংহের স্মৃতি থেকে পাই পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের এক উৎকৃষ্ট তুলনামূলক আলোচনা করছেন স্বামীজি—

"স্বামী শিবানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিলাতী সঙ্গীত কেমন?'

স্বামীজী॥ খুব ভাল, harmony-র চূড়ান্ত, যা আমাদের মোটেই নেই। তবে আমাদের অনভ্যস্ত কানে বড় ভাল লাগে না। আমারও ধারণা ছিল যে, ওরা কেবল শেয়ালের ডাক ডাকে। যখন বেশ মন দিয়ে শুনতে আর বুঝতে লাগলুম, তখন অবাক হলুম। শুনতে শুনতে মোহিত হয়ে যেতাম। সকল art-এরই তাই। একবার চোখ বুলিয়ে গেলে একটা খুব উৎকৃষ্ট ছবির কিছু বুঝতে পারা যায় না। তার উপর একটু শিক্ষিত চোখ নইলে তো তার অগ্নি-সন্ধি কিছুই বুঝবে না। আমাদের দেশের যথার্থ সঙ্গীত কেবল কীর্তনে আর ধ্রুপদে আছে। আর সব ইসলামী ছাঁচে ঢালা হয়ে বিগড়ে গেছে। তোমরা ভাবো, ঐ যে বিদ্যুতের মত গিটকিরি দিয়ে নাকী সুরে টপ্পা গায়, তাই বুঝি দুনিয়ার সেরা জিনিস। তা নয়। প্রত্যেক পর্দায় সুরের পূর্ণবিকাশ না করলে music-এ (গানে) science (বিজ্ঞান) থাকে না। Painting-এ (চিত্রশিল্পে) nature (প্রকৃতি)-কে বজায় রেখে যত artistic (সুন্দর) কর না কেন ভালই হবে, দোষ হবে না। তেমনি music-এর science বজায় রেখে যত কারদানি কর, ভাল লাগবে। মুসলমানেরা রাগরাগিণীগুলোকে নিলে এদেশে এসে। কিন্তু টপ্পাবাজিতে তাদের এমন একটা নিজেদের ছাপ ফেললে যে, তাতে science আর রইল না।

প্রশ্ন॥ কেন science মারা গেল? টপ্পা জিনিসটা কার না ভাল লাগে?

স্বামীজী॥ ঝিঁঝি পোকার রবও খুব ভাল লাগে। সাঁওতালরাও তাদের music অত্যুৎকৃষ্ট বলে জানে। তোরা এটা বুঝতে পারিস না যে, একটা সুরের ওপর আর একটা সুর এত শীঘ্র এসে পড়ে যে, তাতে আর সঙ্গীতমাধুর্য (music) কিছুই থাকে না, উল্টে discordance (বে-সুর) জন্মায়। সাতটা পর্দার permutation, combination (পরিবর্তন ও সংযোগ) নিয়ে এক-একটা রাগরাগিণী হয় তো? এখন টপ্পায় এক তুড়িতে সমস্ত রাগটার আভাস দিয়ে একটা তান সৃষ্টি করলে আবার তার ওপর গলায় জোয়ারী বলালে কি করে আর তার রাগত্ব থাকবে? আর টোকরা তানের এত ছড়াছড়ি করলে সঙ্গীতের কবিত্ব-ভাবটা তো একেবারে যায়। টপ্পার যখন সৃষ্টি হয়, তখন গানের ভাব বজায় রেখে গান গাওয়াটা দেশ থেকে একেবারে উঠে গিয়েছিল! আজকাল থিয়েটারের উন্নতির সঙ্গে সেটা যেমন একটু ফিরে আসছে, তেমনি কিন্তু রাগরাগিণীর শ্রাদ্ধটা আরও বিশেষ করে হচ্ছে।

এইজন্য যে ধ্রুপদী, সে টপ্পা শুনতে গেলে তার কষ্ট হয়। তবে আমাদের সঙ্গীতে cadence (মিড়, মূর্চ্ছনা) বড় উৎকৃষ্ট জিনিস। ফরাসীরা প্রথমে ওটা ধরে, আর নিজেদের music-এ ঢুকিয়ে নেবার চেষ্টা করে। তারপর এখন ওটা ইওরোপে সকলেই খুব আয়ত্ত করে নিয়েছে।

প্রশ্ন॥ ওদের music-টা কেবল martial (রণবাদ্য) বলে বোধ হয়, আর আমাদের সঙ্গীতের ভিতর ঐ ভাবটা আদতেই নেই যেন।
স্বামীজী॥ আছে, আছে। তাতে harmony-র (ঐকতানের) বড় দরকার। আমাদের hormony-র বড় অভাব, এই জন্যই ওটা অত দেখা যায় না, আমাদের music-এর খুবই উন্নতি হচ্ছিল, এমন সময়ে মুসলমানেরা এসে সেটাকে এমন করে হাতালে যে, সঙ্গীতের গাছটি আর বাড়তে পেলে না। ওদের (পাশ্চাত্যের) music খুব উন্নত, করুণরস বীররস— দুই আছে, যেমন থাকা দরকার। আমাদের সেই কদুকলের আর উন্নতি হল না।
প্রশ্ন॥ কোন্ রাগরাগিণীগুলি martial?
স্বামীজী॥ সকল রাগই martial হয়, যদি harmony-তে বসিয়ে নিয়ে যন্ত্রে বাজানো যায়। রাগিণীর মধ্যেও কতকগুলি হয়।[২৬]

আবার ‘বাঙ্গালা ভাষা’ নামক প্রবন্ধে ভারতীয় সঙ্গীতের অধঃপতন সম্পর্কে স্বামীজি লিখছেন—
“গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না; আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম! সে কি আঁকাবাঁকা ডামাডোল— ছত্রিশ নাড়ীর টান তায় রে বাপ! তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব! এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোন কাজের নয়।”[২৭]

স্বামীজি রচিত গান ও অতুলবাবুর অভিমত— স্বামীজি নিজে কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করেছেন – যদিও তা সংখ্যায় একেবারেই অল্প --শ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্র, অম্বা স্তোত্র, শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিক ভজন, দুটি শিব সঙ্গীত, একটি শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গীত, আর একটি সৃষ্টি ও একটি ‘প্রলয় বা গভীর সমাধি’ নামাঙ্কিত সঙ্গীত। গানগুলিতে গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

নরেন্দ্রনাথের রচিত “নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্কসুন্দর” গানটি শুনে প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের ভাই অতুলবাবু বলেছিলেন, “এই গানটা যে বাধতে পারে, সে একতা বড় লোক – এই একটা গানের জন্য সে জগতে বিখ্যাত হয়ে থাকবে।

বেলা শেষের গান— জীবনের শেষদিকে পৌঁছে স্বামীজি সেইসমস্ত গানগুলিই বেশি করে গাইতেন যেগুলি একসময় তিনি তাঁর গুরু তথা জীবন দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণকে বারে বারে শুনিয়েছেন – বিশেষত শ্যামাসংগীতগুলি। কখনও জীবন সায়াহ্নের কোন অমানিশায় প্রকৃতির নিস্তব্ধ রূপ দেখে গাইছেন – “নিবিড় আঁধারে মা চমকে তোর রূপরাশি” , আবার কখনও পার্থিব শরীরত্যাগের মাত্র কয়দিন আগে শিষ্যসঙ্গে নৌকাযোগে কলিকাতা থেকে মঠে আসতে আসতে গঙ্গাবক্ষের উপর গাইছেন – “কেবল আশার আশা, ভবে আসা, আসামাত্র হল/ এখন সন্ধ্যা বেলায় ঘরের ছেলে ঘরে নিয়ে চল।” এইসময় স্বামীজি নিশ্চয়ই

তাঁর পার্থিব কার্যের শেষে ঘরে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। আর জীবনের শেষ দিনে গাওয়া স্বামীজির কণ্ঠে শেষ গান– “শ্যামা মা কি আমার কালো রে /কালো রূপে এলোকেশী হৃদি পদ্ম করে আলো রে।” এই গানটিও ঠাকুরের অন্যতম প্রিয় গান এবং নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বহুবার শুনিয়েছেন।

নরেন্দ্রনাথ তাঁর সন্ন্যাস পূর্ব জীবনে অথবা সন্ন্যাস জীবনে বা জীবন সায়াহ্নে যখনই গান গেয়েছেন, সে গান যেন তিনি তাঁর জীবন দেবতার উদ্দেশ্যেই নিবেদন করেছেন– তাঁকেই শুনিয়েছেন। স্বামীজি একসময় একটা কবিতা রচনা করেছিলেন– “গাই গীত শুনাতে তোমায়/ভালমন্দ নাহি গনি,/নাহি গণি লোকনিন্দা যশকথা/ দাস তোমা দোঁহাকার, সশক্তিক নমি তব পদে।...” কথাগুলি বহুমাত্রিক অর্থবিশিষ্ট। স্বামীজির জীবনকে যদি একটি মহান গানের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবে সে গানের উদ্দিষ্ট দেবতা অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণ, আবার যখন তিনি সঙ্গীত রচনা করেছেন বা গেয়েছেন তখনও সে গান নিবেদন করেছেন তাঁর ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণকেই। তাই তো তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নিবেদনের সুরে বলতে পারেন—“গাই গীত শুনাতে তোমায় /ভালমন্দ নাহি গণি/ নাহি গণি লোকনিন্দা যশকথা...।”

তথ্যসূত্র :

১। শ্রীরামকৃষ্ণচরিত, ক্ষিতীশ চন্দ্র চৌধুরী, পৃ. ৪৩
২। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৫ম খণ্ড, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, পৃ. ১৮৯
৩। ঐ, পৃ. ১৯১
৪। স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথম ভাগ, প্রমথনাথ বসু, পৃ. ৫৭
৫। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃ. ৬৮
৬। ঐ, পৃ. ৮৭
৭। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজির জীবনের ঘটনাবলী, ১ম খণ্ড, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ৮৫
৮। ঐ, পৃ. ৮৬
৯। স্মৃতির আলোয় স্বামীজি, পৃ. ১৫৮
১০। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজির জীবনের ঘটনাবলী, ৩য় খণ্ড, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ৫৩
১১। ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০-৬১
১২। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃ. ১১০-১২
১৩। স্মৃতির আলোয় স্বামীজি, পৃ. ১৫৯
১৪। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অখণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ. ৬৮-৬৯
১৫। ঐ, পৃ. ১৬০
১৬। ঐ, পৃ. ২৫৩

১৭। ঐ, পৃ. ৭৩৬
১৮। শতরূপে সারদা, পৃ. ২৯
১৯। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃ. ১১৯
২০। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অখণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ. ৯৫৭
২১। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজির জীবনের ঘটনাবলী, ১ম খণ্ড, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ৮৪
২২। ঐ, পৃ. ৩৯
২৩। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃ. ১৮৮-৯০
২৪। ঐ, পৃ. ২০৯ -১০
২৫। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ. ১৭১, ১৯২, ১৯৪, ২০৯
২৬। ঐ, পৃ. ২৫৭
২৭। ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩০
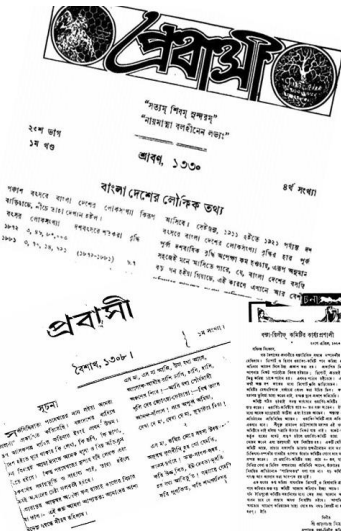
সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং ‘প্রবাসী’-র পাতায় মননশীল রচনা

কৌশিক মুখার্জ্জী

বাঁকুড়ায় তখন কেশবচন্দ্র সেনের ‘সুলভ সমাচার’ সংবাদপত্রের প্রচার ছিল। তার দাম ছিল মাত্র ১ পয়সা। রামানন্দ যখন জেলা স্কুলে পড়তেন তখন এই স্কুলের একমাষ্টারমশাই সপ্তাহে ১৪০ খানা করে কাগজ এনে বিক্রি করতেন। নামের তলায় চার লাইন কবিতা ছাপা থাকত — এরকম

> সহজে পাইতে যদি চাও জ্ঞান ধন।
> সুলভ সংবাদপত্র কর অধ্যয়ন।।[১]

আবার পূজার যা সংখ্যা থাকত, তাতে থাকত নির্মল ব্যঙ্গকৌতুক মিশ্রিত কিছুছবি। পুজো সংখ্যা হত রঙিন কাগজ দিয়ে। একে তো এত খবর তার উপর আবার রঙিন ছবি, জ্ঞান সৌন্দর্যের আশৈশব অনুরাগী রামানন্দের এ কাগজ বড়ই প্রিয় ছিল। তাই হয়তো তিনি শৈশবেই স্বপ্ন দেখতেন — বড় বয়সে সুন্দর করে কাগজ সাজিয়ে ঘরেঘরে সৃজন ও আনন্দ বিতরণ করবেন। বলাই বাহুল্য তাঁর এই মনের স্বপ্নটি পূর্ণ হয়েছিল অত্যন্ত সফলতার সঙ্গেই।

ইংরেজি সাহিত্যের সুপণ্ডিত ও আদর্শ অধ্যাপক হলেও তাঁর সর্বাধিক খ্যাতি মূলত সাংবাদিকতা ও সম্পাদনার জন্যই এবং যে দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করে তিনি এই উচ্চ শিখরে উঠেছিলেন — সেই পত্রিকা দুটি হল ‘প্রবাসী’ (১৯০১ এপ্রিল) ও ‘মডার্ন রিভিউ’[২] (১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ)। সম্পাদক হিসাবেই জনপ্রিয় হলেও তিনি একাধারে ছিলেন মানবদরদী, দেশসেবক, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-দেশজ ঐতিহ্যের একান্ত অনুরাগী, অন্যদিকে শুধু সমাজজীবনে নয়, উন্নয়নকামী একজন লোকশিক্ষক। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে প্রাণিত হলেও সমাজের বহুবিধ জনহিতকর ও শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলিতে তিনি সর্বদা লিপ্ত থাকতেন। এইসব নানাবিধ কারণে মনস্বী রাজনারায়ণ বসু তাঁকে প্রীতিসুলভ ‘স্যার রামানন্দ’ বলে সম্মানিত করেছিলেন।

শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত মানবসেবাই যে প্রকৃত কর্ম তা রামানন্দের জীবনাদর্শে প্রতিভাসিত হয় এবং সাংবাদিক হিসাবে একাজকেই তিনি দায়বদ্ধতা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এত লেখা, Notes, সম্পাদকীয় লিখেছেন কিন্তু গল্প, উপন্যাস, নাটক লেখাতে মন দেন নি। নিজে লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেতে চাননি, চেয়েছিলেন জনসেবক রূপে প্রতিষ্ঠা পেতে এবং মাধ্যম হিসাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন লেখনী ও পত্রিকাকে। রামানন্দবাবু বিশ্বাস করতেন ভারতীয় শিক্ষার উন্নতির জন্য অবিলম্বে শিক্ষার বাধাগুলিকে দূর করতে হবে। স্বভাবতই তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধ তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন লক্ষ্নৌয়ের ইংরেজি সাপ্তাহিক ‘এডভোকেট’ পত্রিকার মাধ্যমে। প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন বলেই একথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে জনশিক্ষাই ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মূল বুনিয়াদ (India’s Political Salvation depends on mass education) আর ঠিক এই কারণেই পরবর্তীকালে অকপটে সমর্থন করেছিলেন — গোপালকৃষ্ণ গোখলের প্রস্তাবিত শিক্ষা-সংস্কার নীতিকে। শুধু শিক্ষা ব্যবস্থায় নয় — সাংবাদিক হিসাবে যেকোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম ধরতে তিনি পিছুপা হতেন না। সেই সময় এলাহাবাদ বা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের যেকোন সমাজকল্যাণ মূলক কাজে তিনি নিতেন অগ্রণী ভূমিকা। যেমন ঐ অঞ্চলে যে মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল — সে কমিটির তিনি ছিলেন সভাপতি। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ঐ অঞ্চলে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, সেই সব দুর্গতদের সাহায্যের জন্য যে `অনাথ-আশ্রম' খোলা হয়েছিল, তার পরিচালনার ভারও ছিল রামানন্দের উপর। এছাড়াও ১৮৯৭-৯৮ খ্রিস্টাব্দে দেশের বিভিন্ন স্থানে যে প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়, সেই সময় নিজ অঞ্চলে তাঁর ভূমিকা ছিল স্মরণযোগ্য।

১৮৯৫ সালের অক্টোবর মাসে সম্পাদক মহাশয় সপরিবারে এলাহাবাদ চলে আসেন ‘কায়স্থ পাঠশালা’র অধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব নেবার জন্য। কলকাতায় থাকাকালীন রামানন্দ ‘দাসী’ পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। এলাহাবাদ আসার পরেও অনেকদিন তিনিসেখান থেকেই `দাসী' পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। এদিকে এলাহাবাদের কায়স্থ পাঠশালার কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ‘কায়স্থ সমাচার’ পত্রিকার সম্পাদনার ভারও নেন তিনি। সেখানে

তিনি শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজে সকলের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং বিনোদন সম্পর্কে নিয়মিত লিখতেন।

এরপর ১৮৯৭ সালে রামানন্দের সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করে 'প্রদীপ' পত্রিকা। প্রকাশক ছিলেন শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ দাস। এ পত্রের সূচনায় তিনি লিখেছিলেন — "শিক্ষণ এবং চিত্ত বিনোদন উভয়ের যথাযোগ্য সংমিশ্রণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা 'প্রদীপ' সম্পাদন এবং পরিচালনের চেষ্টা করিব।"[৩] কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হত 'প্রদীপ', মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। এই পত্রিকার মাধ্যমেই রামানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের সুসম্পর্ক তৈরি হয়। তবে কয়েক বছরের মধ্যে 'প্রদীপ' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব তিনি ত্যাগ করেন। 'প্রদীপ' পত্রিকাটির সম্পাদনাকালেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর হার্দিক সম্পর্কের সূত্রপাত এবং এই পত্রিকাটি সম্পাদনাকালেই যেন তাঁর সাংবাদিকতা ও সম্পাদনার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় মুদ্রিত হত সমাজের কৃতবিদ্য ব্যক্তিত্বদের সচিত্র জীবনী, যা তৎকালীন সমাজে ও সাহিত্যে এক অন্য প্রভাব ফেলে। যেমন — ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, আনন্দমোহন বসু, শিল্পী শশীকুমার হেসা, অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার, প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এর সচিত্র জীবনকাহিনি তিনি প্রকাশ করেন। তিনি নিজেই বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, রসায়নবিদ প্রফুল্লচন্দ্র রায়,শিক্ষাবিদ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনালেখ্য রচনা করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি ১৩০৮ সালে (১৯০১, এপ্রিল) 'প্রবাসী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। যে সময়ে 'প্রবাসী' প্রকাশ পায়, তখন এলাহাবাদে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার দ্বিতীয় যুগ। বাংলাদেশ থেকে এত দূরে প্রবাসে থেকে কি লেখা, কি ছবি ছাপা হবে এ বিষয়ে তাঁকে 'প্রবাসী' প্রকাশ করতে অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছে। তবে প্রথম সংখ্যাতেই সম্পাদক নিজ সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পানুরাগের পরিচয় দেন স্বলিখিত 'অজন্তা গুহা চিত্রাবলী' প্রবন্ধে। ভারতীয় শিল্পের এই অপূর্ব নিদর্শন সম্পর্কে তখনও পর্যন্ত কোন সংবাদপত্র এরকম কিছু প্রকাশ করবার আগ্রহ দেখায়নি। বাস্তবিকভাবেইএলাহাবাদে বসে তিনি প্রায় অসাধ্য সাধন করেছিলেন। তবে একটা জিনিস তিনি অনুভব করেছিলেন কাগজের সম্পাদক যদি তার স্বত্তাধিকারী না হন, তা হলে তাকে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয় এবং নিজের স্বাধীন মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। কেননা স্বাধীনচেতা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রদীপে' সেই অসুবিধা ভোগ করেছিলেন বলেই সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব পত্রিকা 'প্রবাসী' প্রকাশ করেন। রামানন্দ সম্পাদিত নবীন পত্রিকাটিকে গুণী সমাজ সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। 'প্রবাসী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'অজন্তা গুহা চিত্রাবলী' প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিখিলনাথ রায় লিখলেন—

"আমাদের প্রবাসী কবি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রেমাশ্রুজলে ইহার অভিষেককার্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রবাসীও ধন্য, প্রবাসী বাঙালি কবিও ধন্য। স্বর্গীয়কমলাকান্ত শর্মা লোকান্তর হইতে ইহলোকে এবং বঙ্গের বঙ্গদর্শন হইতে প্রবাসে গেলেন, এ ইন্দ্রজাল কে ঘটাইল? তাঁহার নাম গোপন করিয়া ফাঁকি দিতে পারিবেন না — কবির লেখনী ছাড়া এ যাদু আর কোথায়? যে কবি অশোকমঞ্জরী হইতে তাহার তরুলতা এবং বধূর ভূষণঝঙ্কার

হইতে তাহার রহস্য কথাটি চুরি করিয়া লইতে পারেন তিনি যে রাতারাতি বঙ্গদর্শন হইতে তাহার কমলাকান্তটিকে হরণ করিয়া প্রবাসে পলাইবেন, ইহাতে আশ্চর্য হই না। কিন্তু চোরকে যদি আমাদের বঙ্গদর্শনে বাঁধিতে পারি তবেই তাঁহার উপযুক্ত শাস্তি হইবে। অজন্তা গুহা চিত্রাবলী মনোহর সচিত্রপ্রবন্ধ। ...”[৪]

সাংবাদিকতার এই উত্তুঙ্গ শিখর রামানন্দবাবু পৌছেছিলেন সুকঠিন সাধনার দ্বারা। তাঁর তিরোধানের অল্পদিনের মধ্যেই সারা ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের (All India Newspaper Editor's Conference) এক স্মরণসভায় সকলে মিলিত হয়ে 'ভারতীয় সাংবাদিকতার শ্রেষ্ঠ প্রতিমূর্তি' (The Greatest Figure Indian Journalism has produced) বলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। The Statesman পত্রিকাও তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান যে তিনি ছিলেন সাফল্যের থেকে বড়।

নিজের সম্পাদিত 'প্রবাসী', 'Modern Review' পত্রিকা ছাড়াও সমকালীন ভারতের বহু নামী দামী পত্রিকাতে তিনি লেখার মাধ্যমে ক্ষতিকর অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছেন। সে যুগের দুটি বিখ্যাত পত্রিকা হল– 'Indian Social Reformer' এবং 'Social Welfare'. এরমধ্যে প্রথমটি রামানন্দবাবুকে উল্লেখ করেছেন– Ramananda was a great force making for unity and good will among all castes and communities. এবং দ্বিতীয় পত্রিকাটি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন– Ramananda dominated the scene of Indian Journalism for about half a century. He had successfully brought the Indian problems to the notice of the people of other nations. He was a terrible fighter. Against the greatest of difficulties has fight was the keenest.[৫]

রামানন্দ শুধু মাত্র সুপণ্ডিত বা সাহসী সম্পাদকই ছিলেন না; ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য খবরের আধার। Rev. J. T. Sunderland তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। শুধু তিনি মানবতার পূজারীই নন, তিনি বাংলার অর্থনৈতিক ভিত্তিকে শক্ত করার অভিপ্রায়ে সবরকম প্রচেষ্টা করেছিলেন, নিজ পত্রিকার মাধ্যমে। এই ব্যাপারে তিনি একদিকে বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশগুলির উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে পর্যবেক্ষণ ও অনুসরণ করার কথা বলেছেন। অন্যদিকে বিজাতীয় সরকারের দয়া ভিক্ষার উপর নির্ভর না করে স্বয়ম্ভরতার উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন যে, “ইংরেজরা যেমন ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষণীয় বিষয় আত্মস্থ করে নিজজাতির শরীরে পুষ্টি বর্ষণ করেছে, তেমনি বাঙলার জনগণকেও সর্বপ্রথম ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলির প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। বিভিন্ন প্রদেশে চাষের রীতি, সেচব্যবস্থা,ব্যবসা-বাণিজ্যের নীতি, শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী, বস্ত্রবয়ন, চিনি ও গুড়ের ব্যবসাপ্রভৃতি বিষয়গুলিতে আরো বেশী অভিজ্ঞতা অর্জন করা আবশ্যক।”[৬]

সম্পাদক হয়ে রামানন্দ বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামোকে মজবুত করবার অভিপ্রায়ে– 'ব্যবসা বাণিজ্যে বাঙালীর দক্ষতা নাই', 'বাঙালীর ব্যবসাবুদ্ধি নাই' —এই ধরনের প্রচলিত সমালোচনাগুলিকে পাশে সরিয়ে রেখে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন অতীতেও বাঙালি

বাণিজ্যে সাফল্য পেয়েছিল এবং এখনো পারে। এই সাফল্যের কারণ হিসাবে তিনি দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন—"প্রথমত ইংরেজি শিক্ষা সর্বপ্রথম বাংলায় সম্প্রসারিত হওয়ায় বাঙালী দৈহিক পরিশ্রমলব্ধ উপার্জনের পরিবর্তে কেরানী, ওকালতি, ডাক্তারী প্রভৃতি পেশার প্রতি আকৃষ্ট হয়। দ্বিতীয়ত — বাঙালী সমাজে ও কৃষি এবং শিল্প-বাণিজ্য নির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সামাজিক মর্যাদার আসন থেকে বিচ্যুত হয়। বাঙালীর কেরানী হওয়ার সার্বিক আকাঙ্ক্ষা থেকে দেশের অন্যান্য প্রদেশগুলির থেকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করে দেয়।"[৭] সম্পাদক হিসাবে শুধু বাংলা তথা দেশের আর্থিক উন্নতির চিন্তাই নয়, বাংলার অন্নাভাব, অনটন ও দুর্ভিক্ষও তাঁকে নানাভাবে আলোড়িত করেছিল। এইজন্য ১৯১৯ সালে 'প্রবাসী'র প্রত্যেকটি সংখ্যায় অনিবার্যভাবে দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ, এই দুর্ভিক্ষের কারণ সম্পর্কে সম্পাদকের ভাবনা ও দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় অত্যন্ত সুচারুভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন—"প্রতি মাসে একই কথা লিখতে ইচ্ছা করে না; কেবল অভাব, দৈন্য, নিরুপায় অবস্থার কথা লিখতে কষ্ট হয়, নিজের মনুষ্যত্বের প্রতি সন্দেহ জন্মে, জীবনে ধিক্কার আসে, হতাশায় মন দুর্বল অবসন্ন হইয়া পড়ে।"[৮]

দেশবাসীর এই অভাব, অনাহার ব্যক্তি রামানন্দকে বিচলিত করলেও, সম্পাদক রামানন্দকে হতাশায় ফেলতে পারে নি। তাই তিনি এই দুর্ভিক্ষের কারণ সম্পর্কে সরকারের মনোভাবকে অতিক্রম করে আসল কারণগুলিকে অন্বেষণ করতে চেয়েছিলেন। আবার অন্যদিকে এই দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধের গঠনমূলক উদ্যোগ, ত্রাণ সংগ্রহ, গণচেতনা গড়ে তোলার চেষ্টাও করেছিলেন। যেমন এদেশে রেলপথ স্থাপনের জন্য যে বিপুল পরিমাণ চাষের জমি কমে যায়, তা এক দুর্ভিক্ষের কারণ হিসাবে তিনি নির্ণয় করেছেন। এইপ্রসঙ্গে তিনি 'প্রবাসী' পাতায় উল্লেখ করেছেন — "১৮৯০-৯৫ সালের মধ্যে বাঁকুড়া জেলায় ২০ লক্ষ বিঘা চাষের জমি ছিল, কিন্তু ১৯১০-১৫ সালের মধ্যে গড়ে ৩ লক্ষ বিঘা জমি হ্রাস পায়। কারণ ১৮৯০-১৯১৫ সালের মধ্যে জেলার মধ্যে দুটি রেললাইনের বিস্তারের জন্য প্রচুর জমি গৃহীত হয়েছিল।"[৯]

একদিকে জনগণের দুর্দশাকে লাঘব করবার জন্য ক্রমাগত তাঁর পত্রিকায় প্রচার, অন্যদিকে সহৃদয় ব্যক্তিদের অন্তরে আঘাত করে এ কাজে উৎসাহী করে তোলার নিরলস প্রচেষ্টা তিনি করে গেছেন। সম্পাদকের কথায় —"'প্রবাসী' এবং 'মডার্ন রিভিউ' কার্যালয় দুর্ভিক্ষ ত্রাণ সংগ্রহের অফিসে পরিণত হয়েছিল।"[১০] শুধু দুর্ভিক্ষ নিবারণের প্রচেষ্টাই নয়, বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সম্পাদক রামানন্দ বাংলার বিভিন্ন জেলায় গড়ে ওঠা জল সরবরাহ সমিতিগুলির সাফল্যকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে এই জল সরবরাহ সমিতিগুলির কর্মসূচি ও সেচের উন্নতি পশ্চিমবাংলায় রুক্ষ জেলাগুলির মুক্তির পথ তৈরি করে দেয়। সম্পাদক বাঁকুড়ার দৃষ্টান্ত তুলে এনে দেখিয়ে দেন যে —"এই জেলায় 'কৃষি ও হিতসাধন' সমিতির চেষ্টায় ৮২টি জল সরবরাহ সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। সেচের ক্রমপ্রসারের ফলে যে জমিতে বছরে একবার ধান চাষ হওয়া ছিল কঠিন, সেখানে সেচের কল্যাণে ধান ছাড়াও গম ও অন্যান্য ফসল উৎপাদিত হচ্ছে।"[১১]

শুধু কৃষিতে নয়, বিভিন্ন ধরনের দেশীয় কারিগরি শিল্পগুলি যেমন রেশম, কাঁসা-পিতল,তাঁত, চামড়া প্রভৃতি শিল্পগুলির উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সমবায় যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, এই বিশ্বাস ছিল রামানন্দের। একইভাবে বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সরকারের ঔদাসীন্যকে চরমভাবে আঘাত করেছেন নিজ পত্রিকার মাধ্যমে। সমাজ মঙ্গলের প্রতি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন সম্পাদক। তাঁর বিবিধ রচনায় এবং সম্পাদকীয়তে এই সম্পর্কিত লেখা ছাপা হয়েছে বারবার। যেমন, 'ঐতিহাসিক তীর্থযাত্রা', 'প্রাদেশিককথিত বাংলা', তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিনোদনমূলক রচনার পাশাপাশি সম্পাদক মহাশয় প্রকাশ করতেন বুদ্ধিদীপ্ত, তথ্যপূর্ণ মননশীল রচনা 'প্রবাসী'র পাতায়। বুদ্ধিদীপ্ত বিচার শক্তিসম্পন্ন রচনাকে মননশীল রচনা বলা হয়। (বাংলা অভিধান - ৬৮১)

'প্রবাসী' পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালিদের হিত সাধন করা, তাদের কৃতিত্বের কথা প্রচার করা, বাংলাদেশের ঐতিহ্যের কথা প্রকাশ করা। তাই যেন পরাধীন ভারতবর্ষে বাঙালী জাতিকে জাতীয় জাগরণে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস `প্রবাসী'র পাতায় লক্ষ্য করা যায়। 'প্রবাসী'তে লেখা হত সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্পকলা, রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিষয়ক রচনা। এর পাশাপাশি থাকত সম্পাদক মহাশয়ের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মতামত। সেইসব মতামতগুলি সম্পাদক মহাশয় লিপিবদ্ধ করতেন প্রবাসীর 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বিভাগটিতে। এই বিভাগটিতে থাকত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা, সমালোচনা ও বিচারপূর্বক তত্ত্বমূলক রচনা। তাই এই 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বিভাগটি ছিল পাঠকের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। সেখানে থাকত ধর্ম, ধর্মসম্প্রদায়, সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ক প্রবন্ধ, ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষর ধর্ম ও আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ, হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ক রচনা। তাছাড়াও প্রবাসীর পাতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, সারদাদেবী, ভগিনী নিবেদিতা, রামকৃষ্ণমণ্ডলী প্রসঙ্গে রচনা। বিশ্বের বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞান সাধনার কথা প্রকাশিত হত প্রবাসী পত্রিকায়। তাই অনেক পাঠকেরই জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছিল এই পত্রিকা। 'প্রবাসী'র প্রবন্ধগুলি ছিল সর্বজনস্বীকৃত সম্পদ ও গুরুগম্ভীর, তথ্যযুক্ত। সম্পাদক মহাশয় তথ্যমূলক রচনার কঠোর পক্ষপাতী ছিলেন। তাই 'প্রবাসী'র বেশিরভাগ রচনা ছিল শিক্ষামূলক। সমসাময়িককালের রাজনীতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, ধর্ম, শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য, হিন্দুসমাজের গড়ন প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে অকুণ্ঠভাবে মতামত প্রকাশ করতেন সম্পাদক মহাশয় প্রবাসীর পাতায়।

'প্রবাসী' সম্পাদক মহাশয় ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান। কিন্তু ছিলেন পৌত্তলিক দেবদেবী বিরোধী ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী। তবে তিনি হিন্দু সংস্কৃতির সংস্কার ভুলে যাননি । হিন্দুধর্ম ছিল তাঁর মর্মে গাঁথা। কিন্তু হিন্দু ও ব্রাহ্ম এই দুই ধর্ম নিয়ে ছিল তাঁর দ্বিধা। সম্পাদক মহাশয় মনে করতেন ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্ম থেকে উদ্ভুত এবং এরকম মতামতই প্রকাশ পেয়েছে প্রবাসীর পাতায়। তবে তার চিত্তসংকট ঠুনকো হিন্দু ও ব্রাহ্ম ধর্ম নিয়ে ছিল না, তাঁর ছিল স্বদেশী ও বিদেশী সংস্কারের দ্বন্দ্ব। এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি নিয়ে দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে এবং যা প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসীর পাতায়। যেমন 'ধর্মের প্রকাশ কি শুধু অতীতে আবদ্ধ' (১৩২৩), 'পরাধীন জাতির মধ্যে

ধর্মোপচেষ্টার আবির্ভাব’ (১৩৪৫), ‘ব্রিটিশ শাসন ও ভারতীয় সংস্কৃতি’ (১৩৪৫), ‘ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা’ (১৩৪৬), ‘ভারতে আধ্যাত্মিকতার নূতন আততায়ী’ (১৩৪৬), ‘দুই সংস্কৃতির সংঘর্ষে কি হয়?’ (১৩৪৭) প্রভৃতি রচনা।

‘ধর্মের প্রকাশ কি শুধু অতীতে আবদ্ধ’ (১৩২৩) রচনায় মূল কথা হল ধর্মমত বিবর্তিত হয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। যুগে যুগে কালে কালে ধর্মও নতুন নতুন মত ও পথ আবিস্কার করে। তাই বলে সেই অভিমতগুলি পুরনো কোনো অংশেই আঘাত করে না। প্রাবন্ধিক তুলে ধরেছেন ধর্মসাধক তুলসীদাস, রবিদাস, দাদূ, তুকারাম, একনাথ প্রমুখ ব্যক্তিদের ধর্মবিশ্বাসের কথা। তাছাড়াও উদাহরণ দিয়েছেন চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ প্রমুখ ধর্মসাধকদের কথা। এখানে বলা হয়েছে —“ধর্মের প্রকাশ শুধু অতীতকালে আবদ্ধ নহে; তাহার বিকাশ ও প্রকাশ এখনও চলিতেছে এবং পরেও চলিবে। কেহ নূতন কিছু বলিলে বা করিলেই তাহাকে হিন্দুধর্মের বা অন্য কোন ধর্মের বিরোধী মনে করিবার কোনো কারণ নাই। .... জ্ঞান ও ধর্মের নূতন আলোককে ভয় করাও খুব আশার লক্ষণ নহে।”[১২]

‘প্রবাসী’ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যও হয়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষক কেদারনাথের কাছ থেকে রামকৃষ্ণদেবের জীবন ও ভাবাদর্শের কথা জেনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন। তার পরিচয় পাই প্রবাসীর পাতায় রামকৃষ্ণ-সারদা দেবী-বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার প্রসঙ্গ উপস্থাপনায়। ১৩১১ এ ‘প্রবাসী’তে সম্পাদক রামানন্দ রামকৃষ্ণ কথামৃতের নির্বাচিত অংশ প্রকাশ করেন। ১৯৩৬-৩৭ সালে বাংলা ও সারা ভারতে বিপুল আয়োজনে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়েছিল। এই সূত্রে রামানন্দ প্রবাসীতে একাধিক সম্পাদকীয় টীকায় উদ্দীপনার সঙ্গে রামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। রামকৃষ্ণ বিষয়ক তিনি তিনটি স্মৃতিকথা বের করেছিলেন প্রবাসীতে । যেমন, ১৩৪১ এ শিবনাথ শাস্ত্রী-র ‘পরমহংস রামকৃষ্ণ’, ১৩৪২-এ কৃষ্ণকুমার মিত্রের ‘রামকৃষ্ণপরমহংস’ এবং ঐ সংখ্যায় কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের কথা’। রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলী সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয়ের মূল্যায়ন এই — “রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বারা জনমানসের যে কল্যাণ হইয়াছে — ক্ষুদ্র ও ক্ষণভঙ্গুর জীবনসম্বন্ধে বৈরাগ্য, মহৎ ও শাশ্বতের প্রতি অনুরাগ এবং দরিদ্র ও অজ্ঞের সেবার ভার হইতে তাহা হইয়াছে।”[১৩] এছাড়াও প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছে ইন্দুভূষণ রায়ের লেখা ‘শ্রী রামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনী’ (১৩১২), ‘রামকৃষ্ণ কথামৃত’-র একাংশ (১৩১১)। একাধিক নিবেদিতা বিষয়ক রচনা, স্বামী সারদানন্দ কৃত স্বরূপানন্দ স্বামীর জীবনকথা (১৩১৩), স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ সহ একাধিক রামকৃষ্ণ শিষ্য-শিষ্যা এবং বিবেকানন্দর দেহত্যাগ সূত্রে তাঁদের জীবনসাধনার মূল্যায়ন প্রভৃতি। তাছাড়াও প্রকাশিত হয়েছিল রামানন্দের নিজের লেখা শ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্মিনী সারদাদেবীর বহুচিত্র সংবলিত সংক্ষিপ্ত জীবনী (১৩৩১)। রামানন্দ ছিলেন সারদাদেবী চরিত্র মহিমায় মুগ্ধ। জীবনীটি লিখেছিলেন সারদানন্দের ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ’ থেকে সংগৃহীত উপাদানের সাহায্যে তথ্যসমৃদ্ধ এবং চিত্রঘনভাবে।

'প্রবাসী' ছিল কিছুটা রবীন্দ্রকেন্দ্রিক পত্রিকা। উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা রচনার পাশাপাশি তাঁর বেশ কিছু আলোচনা সমালোচনামূলক, জাতীয়তাবাদী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় প্রবাসীর পাতায়। যেমন, 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬) ও 'কালান্তর' (১৯৩৭) ইত্যাদি। তাছাড়া প্রকাশিত হয় 'কর্তার ইচ্ছাই কর্ম' (১৩২৪), 'ছোট ও বড়' (১৩২৪), 'শিক্ষার মিলন' (১৩১৮), 'সত্যের আহ্বান' (১৩১৮), 'সমস্যা ও সমাধান' (১৩৩০), 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১) প্রভৃতি। মৃত্যুর প্রাক্কালে রচিত হয় 'সভ্যতার সংকট'। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ হল 'কালান্তর' ও 'সভ্যতার সংকট'। 'কালান্তর' গ্রন্থে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। সাম্যের স্বরূপ কেমন এই প্রবন্ধে সেই কথায় ব্যক্ত হয়েছে।এই গ্রন্থে তিনি ইংরেজ সরকারের শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় ধিক্কার জানিয়েছেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে রচিত 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ সরকারের শোষণনীতি সম্পর্কে ধিক্কার জানিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্করতা উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ মানবসমাজকে জাগতে বলেছেন। এই প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে সেই চিরন্তন বাণী যে— মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।

রাশিয়ায় শিক্ষা, সমাজ এবং জীবনভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় 'রাশিয়ার চিঠি' প্রবন্ধে যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। রাশিয়ার চিঠিকে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বলা যেতে পারে। এই গ্রন্থে আছে চোদ্দটি পত্র এবং একটি উপসংহার। রাশিয়ায় সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেখানে তাঁর ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য খুব একটা চোখে পড়েনি। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আভিজাত্যের অহংকারও দেখেননি। রাশিয়ায় রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন শিক্ষায় জোয়ার রাশিয়া ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং তাদের সংস্কৃতি, দর্শন, ইতিহাস হল 'রাশিয়ার চিঠি'র মূল প্রতিপাদ্য। 'সাহিত্যের পথে' রচনাগ্রন্থটি সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক গ্রন্থ। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের বেশিরভাগ প্রবন্ধই 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্য বিচার, সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্যরূপ এবং বিশেষ বিশেষ কবি-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে লিখেছেন। তাছাড়া সাহিত্য সমালোচনামূলক কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসীর পাতায়। যেমন ১৩১৮-এ প্রকাশিত হয়েছিল 'সমালোচনা', 'সমালোচনার আকাঙ্খিত প্রকৃতি' ইত্যাদি। 'সমালোচনার আকাঙ্খিত প্রকৃতি' রচনায় সমালোচনার উপকারিতাও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে সমালোচনাপূর্বক যা কিছু করা হয় তাতে ভুল হবার সম্ভাবনাকম থাকে। সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে প্রাবন্ধিকের মতের মিল নাও থাকতে পারে, কিন্তু পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই । তাই প্রবাসী পত্রিকায় 'মাসিকপত্রের প্রবন্ধ প্রসঙ্গ' শীর্ষক রচনায় সম্পাদক তা প্রকাশ করেছেন —"বস্তুতঃ প্রবন্ধ লেখকগণের মতের সহিত সম্পাদকের মতের মিল না থাকিলেও যেমন অনেক প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়, তেমনি কোন কোন সমালোচনা সম্পাদকের মতের বিপরীত হইলেও তাহা ছাপা হইতে পারে।"[১৪]

বাংলা লিখিত গদ্যভাষার রীতির পরিবর্তনের যুগসন্ধিকালে প্রকাশিত হয়েছিল 'নানামুনির নানা মত'। তার প্রতিফলন পড়েছিল প্রবাসীর পাতায়। সাহিত্য রচনায় ভাষা

সংকট একটা বিশেষ সমস্যা। বিশ শতকের প্রথমদিকে সাধু ও চলিত ভাষারীতি নিয়ে লেখকদের মধ্যে দ্বন্দ্বের অন্ত ছিল না। সেই সময় প্রমথ চৌধুরী সাধুরীতি থেকে বেরিয়ে এসে চলিত রীতিতে সাহিত্য রচনা করেন। তার ফলে তাঁকে অনেক সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তখন বাংলা ভাষা বিষয়ক বিভিন্ন মননশীল রচনা প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসীর পাতায়। যেমন — 'বাংলা ভাষার আকার' (১৩২০), 'সাধুভাষা ও কথিতভাষা' (১৩২২), 'সাহেবী বাঙলা' (১৩২২), 'রচনার বই' (১৩১২), 'বাংলা ভাষার উৎপত্তিও ক্রমবিকাশ' (১৩৩৩), 'বাংলা বানান' (১৩৪৪) ইত্যাদি ।

'বাঙলা ভাষার আকার' প্রবন্ধটিত প্রমথ চৌধুরির চলিত বাংলার বেশ কিছু শব্দ সমালোচিত হয়েছে। যেমন—'সন্দেশওয়ালার' 'য়' লোপ পেয়ে তিনি লিখেছেন 'সন্দেশওলা', 'বিয়ে'-এর 'বে', 'বেহাই' হয়েছে 'বেই', 'বেহান' হয়েছে 'বেন' ইত্যাদি। এই প্রবন্ধের মূল কথা সাহিত্যে বানানের বাঁধ দেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়াও ব্যাকরণের বিভিন্ন সূত্রগুলি যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সাধু বা চলিত যে রীতিতেই লেখা হোক না কেন কৃতি লেখকদের রচনা আপনিই সজীব হয়ে ওঠে। লেখার জন্য দুটো জিনিস থাকা উচিত— এক হল লেখার বিষয় ও লেখায় নিষ্ঠা থাকা। আবার 'বাংলা ভাষার উৎপত্তি ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধে ভাষাবিদ্ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘকাল বাংলা ভাষা নিয়ে গবেষণা বিষয়ক পুস্তকের প্রশংসা করেছিলেন।

'প্রবাসী' পত্রিকায় দেখা যায় বেশ কিছু বিজ্ঞান ভিত্তিক রচনা। তাই প্রবাসীর পাতা উল্টালে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে আচার্য জগদীশচন্দ্রের মানব প্রতিভা প্রকাশ সর্বাধিক স্থান অধিকার করে আছে। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি রামানন্দের ছিল শ্রদ্ধা ও আনুগত্য, তাঁর বিজ্ঞানচর্চাকে জনগোচর করবার একটা প্রয়াস দেখা গিয়েছিল সম্পাদক মহাশয়ের। প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় জগদীশচন্দ্র বসুর বেশ কিছু প্রবন্ধ— ১৩১৮ সালে বৈশাখে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর মৈমনসিংহ অধিবেশনে সভাপতি বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অভিজ্ঞান, 'বিজ্ঞানে সাহিত্য' নামে প্রকাশিত হয়। ১৩২৯-এ প্রকাশিত হয় 'বৃক্ষর অঙ্গভঙ্গী'। জগদীশচন্দ্র ছিলেন মৌল সত্য সন্ধানী যেখানে বিজ্ঞান ও দর্শন মিলে একাকার হয়ে যায়।

প্রবাসীতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বেশ কিছু বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৩০৯ থেকে ১৩৪২ অবধি প্রবাসীতে প্রকাশিত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের রচনা সংখ্যা প্রায় সাঁইত্রিশটি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'বিজ্ঞান সভা: পুরাতন ও নতুন' (১৩১১),'বঙ্গদেশে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা' (১৩১৩), 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' (১৩১৩), 'বঙ্গসাহিত্যেবিজ্ঞান' (১৩১৫), 'হফম্যান ইংলণ্ডে রসায়ন শিক্ষায় ভূমিকা' (১৩১৬) ইত্যাদি।

অতঃপর বলা যেতে পারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানসাধনার প্রতিফলন প্রবাসীর পাতায় পড়েছিল। বাঙালি জাতিকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার বার্তা পৌঁছে দিতে 'প্রবাসী'র ভূমিকা ছিল অপরিসীম। প্রবাসীর পাতায় প্রকাশিত মননশীল রচনাগুলি দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছিল, যা বাঙালী পাঠকের মনন ও চিন্তনের উৎকর্ষতা সাধিত

করছিল। তাই বুদ্ধিদীপ্ত রচনাগুলি পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম হিসাবে 'প্রবাসী'র ভূমিকা অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র

১। 'ভারত-মুক্তিসাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা', শান্তা দেবী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, পৃ. ৪৬

২। 'মডার্ন রিভিউ' — রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা, প্রথম প্রকাশ — ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ

৩। 'প্রদীপ' (১৩০৪, পৌষ; ডিসেম্বর, ১৮৯৭), সূচনাংশ থেকে উদ্ধৃত (দ্রষ্টব্য - রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল, দশম খণ্ড, পৃ. - ৫৪-৫৬)

৪। 'ভারত-মুক্তিসাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা', শান্তা দেবী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা — ৭৩, পৃ. - ১৪০

৫। 'এবং এই সময়', শীত সংখ্যা, ১৪২১, সম্পা - অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্থক প্রকাশনী, প্রকাশক - বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা - ৬০, পৃ. ২৯৫

৬। 'প্রবাসী' সচিত্র মাসিক পত্র, সম্পাদক - রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ১৩১৯, শ্রাবণ, পৃ. ৪৫৮

৭। 'প্রবাসী' সচিত্র মাসিক পত্র, সম্পাদক - রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ১৩৪০, আষাঢ়, পৃ. ৪৩৯

৮। 'প্রবাসী' সচিত্র মাসিক পত্র, সম্পাদক - রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ১৩২৬, আষাঢ়, পৃ. ২৭৭

৯। 'প্রবাসী' সচিত্র মাসিক পত্র, সম্পাদক - রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ১৩২৬, বৈশাখ, পৃ. ৮৯

১০। 'Modern Review', 1928, July, p. 115

১১। 'প্রবাসী' সচিত্র মাসিক পত্র, সম্পাদক - রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ১৩৩১, বৈশাখ, পৃ. ১১৮

১২। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' ইতিহাসের ধারা, (৪র্থ খণ্ড), সম্পাদনা শঙ্করীপ্রসাদ বসু, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ২০, পৃ. ৮-৯

১৩। 'প্রবাসী' সচিত্র মাসিক পত্র, সম্পাদক - রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ১৩৩৮, আশ্বিন, পৃ. ২২

১৪। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' ইতিহাসের ধারা, (১ম খণ্ড), শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও সুদীপ বসু, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ২০, পৃ. ৩৭৭

বর্তমান যুব সমাজ ও স্বামী বিবেকানন্দ

মিলন মিশ্র

আঠার থেকে উনচল্লিশ বছর বয়সী মানুষদের যুবক বলা হয়। একটা দেশের মোট জনসংখ্যার বেশরিভাগটাই হল এই যুবক। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ হল গণতান্ত্রিক দেশে। তাই এই যুবকদের দেওয়া ভোটের উপর নির্ভর করে দেশের সরকার গঠিত এবং পরিবর্তিত হয়। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে এই যুবকদের হাতে দেশের ভাল-মন্দ অনেককিছু নির্ভর করছে। যুবক বয়সের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। বলা হয় এটি হল জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই যুক্তির পেছনে আবার কিছু কারণও রয়েছে। যুবক বয়সে মানুষ থাকে কর্মচঞ্চল। শরীর ও মন উভয়ই এই সময় শক্তিতে ভরপুর থাকে। মানুষ চাইলে এই সময় সব কিছু করতে পারে। সেই সম্ভাবনা ও শক্তি দুই-ই এই সময় মানুষের মধ্যে থাকে।

কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যুব সমাজ যেন একটা সমস্যার মধ্যে আছে। কোনো কিছুর একটা অভাব যেন যুবমনকে সর্বদা বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। যুবকরা যেন দিশাহারা হয়ে পড়েছে। যুবক বয়স হল জীবনকে গড়ার সময়, জীবনে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সময়। কিন্তু এই সময় যুবকরা বিভিন্ন ভাবে তাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ছে। যথাযথ আদর্শের অভাবে তারা বিভিন্ন খারাপ কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে, ফলে তাদের জীবনটা গড়ার বদলে ধংসের দিকে চলে যাচ্ছে। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে তারা বিভিন্ন

রাজনৈতিক পতাকার তলে আশ্রয় নিচ্ছে এবং বর্তমান রাজনৈতিক ধারা অনুযায়ী তারাও বিভিন্ন দুর্নীতিমূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে। যখন যুবকদের ভালো করে পড়াশোনা করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার সময়, তখন তারা বিভিন্ন নেশার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় অত্যাধিক বেশি সময় অপচয় করছে, পাড়ার মোড়ে বা চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছে বা ক্লাবে গিয়ে বিভিন্ন কুরুচিকর আলোচনার মধ্য দিয়ে সময় কাটাচ্ছে। ব্যায়াম করে শরীর গঠনের বদলে অনলাইন গেম খেলে শরীর ও মস্তিষ্কের চরম ক্ষতি করছে। যুবকেরা এখন বড্ড বেশি স্বার্থপর হয়ে পড়েছে। যে যুবকদের হাতে দেশ-গঠনের ভার অর্পিত, তারা কিনা শুধুমাত্র নিজেদের ভোগ-সুখ নিয়েই ব্যস্ত। মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতাটাও যেন তাদের মধ্য থেকে হারিয়ে গেছে। স্বামী বিবেকানন্দের সময়েও যুবকদের মধ্যে একটা নেতিবাচক মনোভাব দেখা গিয়েছিল। স্বামীজির জাপান থেকে লেখা এক চিঠিতে আমরা পাই, স্বামীজি লিখছেন, "তোমরা কি করছ? সারা জীবন কেবল বাজে বকছ। এস, এদের [জাপানীদের] দেখে যাও, তারপর যাও—গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে! তোমরা—দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাত যায়!! এই হাজার বছরের ক্রমবর্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, হাজার হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধতা বিচার করে শক্তিক্ষয় করছ! পৌরহিত্য-রূপ আহাম্মকির গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছ! শত শত যুগের অবিরাম সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—তোমরা কি বল দেখি? আর তোমরা এখন করছই বা কি? আহাম্মক, তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধরে পায়চারি করছ! ইউরোপের মস্তিষ্কপ্রসূত কোন তত্ত্বের এক কনামাত্র—তাও খাঁটি জিনিস নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছ, আর তোমাদের প্রাণমণ সেই ৩০.০০ টাকার কেরানিগিরির দিকে পড়ে রয়েছে; না হয় খুব জোরে একটা দুষ্ট উকিল হবার মতলব করছ। ইহাই ভারতীয় যুবকগণের সর্বোচ্চ আকাঙ্খা।"[১] সেসময় এক দুর্ভেদ্য তমসাবরণ যে যুবকদেরকর গ্রাস করেছিল, তার প্রমাণও আমরা পাই স্বামীজির কথা থেকে। তাঁর কথায়: "দুর্ভেদ্য তমসাবরণ এখন সকলকে সমানভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে আশা নাই; আছে প্রবল ঈর্ষা, স্বজাতিদ্বেষ, আছে দুর্বলের 'যেন তেন প্রকারেণ' সর্বনাশ-সাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহন। এখন তৃপ্তি ঐশ্বর্য-প্রদর্শনে, ভক্তি স্বার্থ-সাধনে, জ্ঞান অনিত্যবস্তুসংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক আচারে, কর্ম পরের দাসত্বে, সভ্যতা বিজাতীয় অনুকরণে, বাগ্মিতা কটু-ভাষণে, ভাষার উৎকর্ষ ধনীদের অত্যদ্ভুত চাটুবাদে বা জঘন্য অশ্লীলতা-বিকিরণে।"[২]

তাহলে কি আমরা বলতে পারি সব দোষ যুবকদের। পাশ্চাত্যের এক চিন্তাশীল লেখক বলছেন, "একটি শিশুর পক্ষে খুবই দুর্ভাগ্যের কথা, যদি সে এমন একটি পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে যেখানে সৌন্দর্যের প্রতি ভালোবাসা নেই, যেখানে শুদ্ধ ধনলিপ্সার মনোভাব, যেখানে আশৈশব তাকে চিন্তা চিন্তা করতে শেখানো হয় — জীবনে সবচেয়ে

বেশী মূল্যবান জিনিস, কি করে বেশী অর্থ, বেশী ঐশ্বর্য লাভ করা যায় — কি করে বেশী মনুষ্যত্ব, বেশী মহত্ব, বেশী সৌন্দর্য লাভ হয় হয় তা নয়। একটি নবীন জীবনকে ঈশ্বরাভিমুখী (পূর্ণত্বভিমুখী) কক্ষপথ থেকে এভাবে কুশিক্ষার প্রভাবে সবলে বিচ্যুত করা, তার আধ্যাত্মিক কেন্দ্র থেকে তাকে ছিনিয়ে আনবার প্রয়াস , মূল্যহীন সাধারণ জাগতিক লক্ষ্যের দিকে তাকে ঠেলে দেওয়া বড়ই নির্দয় কাজ। যতক্ষণ তার মন নরম আছে, ততক্ষণ তাকে ভাল-মন্দ যে কোন ছাঁচে অনায়াসে ঢেলে সাজানো যায়।"[৩] অর্থাৎ বর্তমান সমাজের রীতি-নীতি এমন হয়ে পড়েছে যা শৈশব অবস্থা থেকেই মানুষের মনে স্বার্থপরতার বীজ বপন করে দিচ্ছে। আজকালকার পিতা-মাতারা ঠিক বুঝতে পারছেন না তারা সন্তানদের ভালো হতে শেখাচ্ছেন, নাকি একটা স্বার্থপর মানুষ হতে শেখাচ্ছেন। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাতেও আমরা দেখতে পাচ্ছি শিক্ষার্থীদের সেরকম কোন শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না যার ফলে তারা নিঃস্বার্থপর মানুষ রূপে গড়ে উঠবে, দেশ ও দশের সেবায় নিজেদের জীবন পণ করবে। অথচ স্বামী বিবেকানন্দ কত আশা নিয়ে বলে গেছেন: "বঙ্গীয় যুবকগণের স্কন্ধে অতি গুরুভার সমর্পিত। আর কখনও কোন দেশের যুবক দলের উপর এত গুরুভার পড়ে নাই। আমি গত দশ বৎসর যাবৎ সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি—তাহাতে আমার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর দিয়াই সেই শক্তি প্রকাশিত হইবে, যাহা ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে। নিশ্চয় বলিতেছি, এই হৃদয়বান উৎসাহী বঙ্গীয় যুবকগণের মধ্য হইতেই শত শত বীর উঠিবে, যাহারা আমাদের পূর্বপুরুষগণের প্রচারিত সনাতন আধ্যাত্মিক সত্য প্রচার করিয়া ও শিক্ষা দিয়া জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত—এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্যন্ত ভ্রমণ করিবে।"[৪] দেশের যে এই হাজারো সমস্যা রয়েছে তা দূর করার দায়িত্ব এই যুবকদেরই। স্বামীজির কথায়: "উদীয়মান যুবকসম্প্রদায়ের উপরেই আমার বিশ্বাস। তাহাদের ভিতর হইতেই আমরা আমি কর্মী পাইব । তাহারাই সিংহবিক্রমে দেশের যথার্থ উন্নতি-কল্পে সমুদয় সমস্যা পূরণ করিবে।"[৫]

তাই আমাদের দেশকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হলে এই যুবকদের উপযুক্তভাবে গড়ে ওঠা খুব জরুরি। তাহলে এখন যুবকদের কেমন হতে হবে, যুবকদের মধ্যে কি কি গুণাবলি থাকা প্রয়োজন, তাদের লক্ষ্য ও আদর্শ কি হওয়া উচিত সেসব আমাদের জানা প্রয়োজন। আর এইসব প্রশ্নের উত্তর আমরা সবচেয়ে ভালো পেতে পারি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে। স্বামীজি যে শুধু একজন হিন্দু সন্ন্যাসী ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন একজন যথার্থ যুবনেতা যিনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এই যুবকদের মনে শক্তি সঞ্চার করার জন্য। স্বামীজির বিভিন্ন বক্তৃতা, চিঠিপত্র, ঘরোয়া আলোচনা প্রভৃতি থেকে আমরা জানতে পারি তিনি যুবকদের উদ্দেশ্যে কি কি বার্তা দিয়ে গেছেন।

প্রথমত, স্বামীজি চাইতেন যুবকরা যেন নীতিপরায়ণ ও সাহসী হয়। যুবকদের মধ্যে কোনরূপ ভীরুতা বা কাপুরুষতা তিনি একদম চাইতেন না। স্বামীজির কথায়: "নীতিপরায়ণ ও সাহসী হও, হৃদয় যেন সম্পূর্ণ শুদ্ধ থাকে। সম্পূর্ণ নীতিপরায়ণ ও সাহসী হও—প্রানের ভয় পর্যন্ত রাখিও না। ধর্মের মতামত লইয়া মাথা বকাইও না। কাপুরুষেরাই

পাপ ক্রিয়া থাকে, বীর কখনও পাপ করে না—মনে পর্যন্ত পাপচিন্তা আসিতে দেয় না।”[৬] কলকাতার যুবকদের উদ্দেশ্য করে স্বামীজি বলেছিলেন, “কলিকাতাবাসী যুবকগণ, উঠ—জাগো, কারণ শুভ মুহূর্ত আসিয়াছে। এখন আমাদের সকল বিষয়ে সুবিধা হইয়া আসিতেছে। সাহস অবলম্বন কর, ভয় পাইও না, কেবল আমাদের শাস্ত্রেই ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া 'অভী:' এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদিগকে 'অভী:'—নির্ভীক হইতে হইবে, তবেই আমরা কার্যে সিদ্ধিলাভ করিব। উঠ—জাগো, কারণ তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলি প্রার্থনা করিতেছেন।...'আশিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মেধাবী' যুবকদের দ্বারাই এই কার্য সাধিত হইবে।”[৭] তিনি আরও বলছেন, “তোমরা কাজ করে চল। দেশবাসীর জন্য কিছু কর—তাহলে তারাও তোমাদের সাহায্য করবে, সমগ্র জাতি তোমার পিছনে থাকবে। সাহসী হও, সাহসী হও! মানুষ একবারই মরে। আমার শিষ্যেরা যেন কখনো কোনমতে কাপুরুষ না হয়।”[৮] স্বামীজি তাঁর “নাচুক তাহাতে শ্যামা” কবিতাতেও যুবকদের উদ্দেশ্যে সাহসী হওয়ার বার্তা দিয়েছেন-

“জাগো বীরভয় কি তোমার সাজে ,শিয়রে শমন ,ঘুচায়ে স্বপন ,?
দুঃখভারপ্রেতভূমি চিতা মাঝে॥ ,মন্দির তাঁহার ,এ ভবঈশ্বর ,
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপারতাহা না ডরাক তোমা॥ ,সদা পরাজয় ,
চূর্ণ হোক্ স্বার্থ হৃদয় ,মান ,সাধ ,শ্মশাননাচুক তাহাতে শ্যামা॥ ,”[৯]

দ্বিতীয়ত, স্বামীজি চাইতেন যুবকেরা যেন শ্রদ্ধাবান ও আত্মবিশ্বাসী হয়। তাই তিনি উপনিষদের নচিকেতা চরিত্রকে এত পছন্দ করতেন এবং যুবকদেরকে নচিকেতার কথা বারবার বলতেন। স্বামীজির কথায়: “আমাদের বালকদের যে বিদ্যাশিক্ষা হচ্ছে, তাও একান্ত নেতিভাবপূর্ণ—স্কুল-বালক কিছুই শিখে না, কেবল সব ভেঙে চুরে যায়—ফল 'শ্রদ্ধাহীনত্ব'। যে শ্রদ্ধা বেদবেদান্তের মূলমন্ত্র, যে শ্রদ্ধা নচিকেতাকে যমের মুখে যাইয়া প্রশ্ন করিতে সাহসী করিয়াছিল, যে শ্রদ্ধাবলে এই জগৎ চলিতেছে, সে 'শ্রদ্ধা'র লোপ।... তাই আমরা বিনাশের এত নিকট। এক্ষণে উপায়—শিক্ষার প্রচার।”[১০] স্বামীজি মনে করতেন যে নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে পারে না সেই নাস্তিক। তিনি বারবার যুবকদের আত্মবিশ্বাসী হতে বলেছেন। যুবকদের মনে আত্মবিশ্বাস আনার জন্য তিনি বলছেন, “আত্মবিশ্বাসরূপ আদর্শই মানব-জাতির সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করিতে পারে। যদি এই আত্মবিশ্বাস আরও বিস্তারিতভাবে প্রচারিত ও কার্যে পরিণত করা হইত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জগতে যত দুঃখ-কষ্ট রহিয়াছে, সেগুলির বেশির ভাগ দূরীভূত হইত। সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে মহাপ্রাণ নরনারীর মধ্যে যদি কোন প্রেরণা অধিকতর শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকে, তাহা আত্মবিশ্বাস।”[১১] জীবনে মুক্তিলাভের জন্যও স্বামীজি আত্মবিশ্বাসকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন—“বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস—নিজের উপর বিশ্বাস—ঈশ্বরে বিশ্বাস—ইহাই উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়। যদি তোমার পুরাণের তেত্রিশ কোটি দেবতার এবং বৈদেশীকেরা মধ্যে মধ্যে যে-সকল দেবতার আমদানি করিয়াছে, তাহার সবগুলিতেই বিশ্বাস থাকে, অথচ যদি তোমার আত্মবিশ্বাস না থাকে, তবে তোমার কখনই মুক্তি হইবে না।”[১২]

তৃতীয়ত, স্বামীজি চাইতেন যুবকরা যেন সবল হয়। শরীর যদি দুর্বল হয় তাহলে কোন কাজেই মন দিয়ে করা যায় না। তাই শরীর সুস্থ-সবল থাকা খুবই জরুরী। স্বামীজি বলছেন, "হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমার সবল হও—তোমাদের নিকট ইহাই আমার বক্তব্য। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমার স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হইবে। আমাকে অতি সাহস পূর্বক এ-কথাগুলি বলিতে হইতেছে; কিন্তু না বললে নয়। আমি তোমাদিগকে ভালবাসি। আমি জানি, পায়ে কোথায় কাঁটা বিঁধিতেছে। আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তোমাদের বলি, তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা আরও ভাল বুঝিবে।"[১৩] অর্থাৎ স্বামীজি বলতে চাইছেন 'গীতা'-র মর্মার্থ বোঝার জন্যও আমাদের সবল থাকা জরুরি। স্বামীজি আরও বলছেন, "আমি চাই এমন লোক—যাদের পেশিসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত-নির্মিত, আর তার মধ্যে থাকবে এমন একটি মন, যা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য, মনুষ্যত্ব—ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ।"[১৪]

চতুর্থত, স্বামীজি চাইতেন যাতে যুবকদের মন একাগ্র হয়। স্বামীজি মনের একাগ্রতাকে সকলের উপরে স্থান দিতেন। মন বশে না এলে কোন কাজই ভালভাবে করা সম্ভব নয়। স্বামীজির কথায়: "মনকে রাশি রাশি তথ্য দিয়া ভরিয়া রাখার নাম শিক্ষা নয়। মনরূপ যন্ত্রটিকে সুষ্ঠুতর করিয়া তোলা এবং উহাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করা—ইহাই হল শিক্ষার আদর্শ।"[১৫] স্বামীজি আরও বলছেন, "আমার মতে মনের একাগ্রতা-সাধনই শিক্ষার প্রাণ, শুধু তথ্য সংগ্রহ করা নহে। আবার যদি আমাকে নুতন করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইত এবং নিজের ইচ্ছামত আমি তাহা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি শিক্ষণীয় বিষয় লইয়া মোটেই মাথা ঘামাইতাম না। আমি মনের একাগ্রতা ও নির্লিপ্ততার ক্ষমতাকেই ক্রমে ক্রমে বাড়াইয়া তুলিতাম; তার পরে ঐভাবে নিখুঁত যন্ত্র-সহায়ে খুশিমত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিতাম। মনকে একাগ্র ও নির্লিপ্ত করিবার ক্ষতাবর্ধনের শিক্ষা শিশুদের একসঙ্গেই দেওয়া উচিত"[১৬] স্বামীজির মতে, মন একাগ্র হলে বিশ্বের সমস্ত কিছুর জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। নিজের মনকে অধ্যয়নের মাধ্যমেই বর্হিজগৎ ও অর্ন্তজগৎ—উভয়ের জ্ঞানলাভই সম্ভব।

পঞ্চমত, স্বামীজি চাইতেন যুবকরা শক্তির আরাধনা করুক। কোনপ্রকার দুর্বলতা যেন যুবকদেরকে ঘিরে না ধরে সে ব্যাপারে তিনি খুব জোর দিতেন। স্বামীজির কথায়: "জীবনের পরম সত্য এই : শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু। শক্তিই সুখ ও আনন্দ, শক্তিই অনন্ত ও অবিনশ্বর জীবন; দুর্বলতাই মৃত্যু।"[১৭] স্বামীজির মতে, পৃথিবীতে যদি পাপ বলে কিছু থেকে থাকে, তবে 'আমি দুর্বল' বা 'ওরা দুর্বল'—এরূপ বলাই একমাত্র পাপ। স্বামীজি বলছেন, "মানুষকে সর্বদা তাহার দুর্বলতার বিষয় ভাবিতে বলা তাহার দুর্বলতার প্রতিকার নয়; তাহার শক্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়াই প্রতিকারের উপায়।"[১৮] স্বামীজি বলছেন, এই শক্তির জাগরণের জন্য আমাদের শক্তিস্বরূপিনী নারী-জাতির পূজা করতে হবে অর্থাৎ নারীদের যথাযথ সম্মান দিতে হবে।

ষষ্ঠত, স্বামীজি চাইতেন যুবকরা যেন নাম, যশ প্রভৃতি তুচ্ছ জিনিসের পিছনে ছুটে তাদের মূল্যবান সময় অপচয় না করে। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে কাজ করাকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিতেন। স্বামীজির কথায়: "ভাব ও সঙ্কল্প যাহাতে কার্যে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা

কর; হে বীরহৃদয় মহান বালকগণ! উঠে পড়ে লাগ! নাম, যশ বা অন্য কোন তুচ্ছ জিনিসের জন্য পশ্চাতে চাহিও না। স্বার্থকে একেবারে বিসর্জন দাও এবং কাজ কর।”[১৯] স্বামীজি আরও বলছেন, “দুইটি জিনিস হইতে বিশেষ সাবধান থাকিবে—ক্ষমতাপ্রিয়তা ও ঈর্ষা। সর্বদা আত্মবিশ্বাস অভ্যাস করিতে চেষ্টা কর।”[২০]

সপ্তমত, স্বামীজি চাইতেন যুবকদের মধ্যে অনুকরণপ্রিয়তা যেন একদম না থাকে। স্বামীজি মনে করতেন অনুকরণ করলে মৌলিকত্ব হারিয়ে যায় এবং কোন কাজই সফল হতে পারে না। স্বামীজির কথায়: “হীন কাপুরুষের মতো অনুকরণ কখনই উন্নতির কারণ হয় না, বরং উহা মানুষের ঘোর অধঃপতনের চিহ্ন। যখন মানুষ নিজেকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে, তখন বুঝিতে হইবে—তাহার উপর শেষ আঘাত পড়িয়াছে।...অতএব তোমরা আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন হও, তোমাদের পূর্বপুরুষগণের নামে লজ্জিত না হইয়া তাহাদের নামে গৌরব অনুভব কর; আর অনুকরণ করিও না, অনুকরণ করিও না। যখনই তোমরা অপরের ভাবানুসারে পরিচালিত হইবে, তখনই তোমরা নিজেদের স্বাধীনতা হারাইবে। এমনকি, আধ্যাত্মিক বিষয়েও যদি তোমরা অপরের আজ্ঞাধীনে কার্য কর তোমরা সকল শক্তি, এমনকি চিন্তাশক্তি পর্যন্ত হারাইয়া ফেলিবে।

তোমাদের ভিতরে যাহা আছে, নিজ শক্তিবলে তাহা প্রকাশ কর, কিন্তু অনুকরণ করিও না; অথচ অপরের যাহা ভাল, তাহা গ্রহণ কর। আমাদিগকে অপরের নিকট শিখিতে হইবে।...অবশ্য অপরের নিকট হইতে আমাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে; যে শিখিতে চায় না, সে তো পূর্বেই মরিয়াছে।... অপরের নিকট ভাল যাহা কিছু পাও শিক্ষা কর, কিন্তু সেইটি লইয়া নিজেদের ভাবে গঠন করিয়া লইতে হইবে।”[২১]

অষ্টমত, স্বামীজি চাইতেন যুবকদের মধ্যে থাকুক অনন্ত শক্তি, অফুরন্ত উৎসাহ, সীমাহীন সাহস এবং অসীম ধৈর্য। যুবকরা যাতে নিজেদেরকে চরিত্রবান রূপে গড়ে তোলে সে ব্যাপারে তিনি খুব জোর দিতেন। স্বামীজির কথায়: “আমি চাই a band of Young Bengal (একদল বাঙালী যুবক); এরাই দেশের আশাভরসা-স্থল। চরিত্রবান, বুদ্ধিমান পরার্থে সর্বত্যাগী এবং আজ্ঞানুবর্তী যুবকগণের উপরই আমার ভবিষ্যত ভরসা—আমার idea (ভাব)-গুলি যারা work out (কাজে পরিণত) করে নিজেদের ও দেশের কল্যাণ-সাধনে জীবনপাত করতে পারবে।”[২২] স্বামীজি চাইতেন এমন শিক্ষার প্রচলন হোক যাতে যুবকেরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। তাঁর মতে, “যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর-সাধারণকে জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করিতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থপরতা, সিংহ-সাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা।”[২৩]

নবমত, স্বামীজি চাইতেন যুকদের মধ্যে থাকুক উদ্যম, স্বাধীনতাপ্রিয়তা এবং চরম উন্নতি-তৃষ্ণা। তিনি মনে করতেন ভারতীয় যুবকরা তমভাব দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তাই তাদের উন্নতির জন্য তাদের মধ্যে রজোগুণের বিকাশ খুব দরকার। স্বামীজির কথায়: “যাহা যবনদিগের ছিল, যাহা অবলম্বনে ইওরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই।...চাই সেই উদ্যম, সেই

স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতা-বন্ধন, সেই উন্নতি-তৃষ্ণা; চাই—সর্বদা-পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখ-প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"[২৪] স্বামীজি চাইতেন যুবকরা যদি কাজ করতে করতে বিফলও হয়, তবু তারা যেন হতাশ না হয়ে পড়ে। স্বামীজি বলছেন, "বিফলতা, ভ্রম থাকিলই বা, গরুকে কখনও মিথ্যা কথা বলিতে শুনি নাই, কিন্তু উহা চিরকাল গরুই থাকে, কখনই মানুষ হয় না। অতএব বার বার বিফল হও, কিছুমাত্র ক্ষতি নাই; সহস্রবার ঐ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ কর, আর যদি সহস্রবার অকৃতকার্য হও, আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখ।" স্বামীজির কথায় প্রবল অধ্যবসায়ের এবং প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমেই সাফল্য লাভ করা সম্ভব।

দশমত, স্বামীজি চাইতেন ভারতীয় যুবকদের অন্তরে থাকা উচিত দেশপ্রেম। দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে তারা যেন আপন ভাবে এবং দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য যেকোন কাজ করতে তারা প্রস্তুত থাকে। স্বামীজি বলছেন, "ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই পশু নয়। প্রভু তোমাদের এই বাঁধাধরা সভ্যতা ভাঙবার জন্য ইংরেজ গভর্নমেন্টকে প্রেরণ করেছেন, আর মাদ্রাজের লোকই ইংরেজদের ভারতে বসবার প্রধান সহায় হয়। এখন জিজ্ঞাস করি, সমাজের এই নূতন অবস্থা আনবার জন্য সর্বান্ত:করণে প্রাণপণ যত্ন করবে, মাদ্রাজ এমন কতগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে প্রস্তুত—যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্ত মুখে অন্ন দান করবে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে, আর তোমাদের পূর্বপুরুষগণের অত্যাচারে যারা পশুপদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে?

ধীর, নিস্তব্ধ অথচ দৃঢ়ভাবে কাজ করতে হবে। খবরের কাগজে হুজুক করা নয়। সর্বদা মনে রাখবে নাম যশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়।"[২৫] স্বামীজি যুবকদের আহ্বান করে বলছেন – "ভুলিও না–নীচজাতিমু ,অজ্ঞ ,দরিদ্র ,মূর্খ ,চিহে !তোমার ভাই ,মেথর তোমার রক্ত , ,আমি ভারতবাসী–সদর্পে বল ;সাহস অবলম্বন কর ,বীরভারতবাসী আমার ভাই। বল– চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ,ব্রাহ্মণ ভারতবাসী ,দরিদ্র ভারতবাসী ,মূর্খ ভারতবাসী; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণআমার ,ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা ,ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর , যৌবনেরউপবন ,ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ–বল ভাই ;আমার বার্ধক্যের বারাণসী , ,রাত-আর বল দিন ;ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ'হে গৌরীনাথআমায় ,হে জগদম্বে , "আমায় মানুষ কর। ,আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর ,মা ;মনুষ্যত্ব দাও[২৬] প্রতিটি মানুষের মধ্যেই সেই ঈশ্বর আছেন, সুতরাং এই দরিদ্র নর-রূপী নারায়ণের সেবাই একমাত্র ধর্ম। স্বামীজি বলছেন, "পড়েছ, 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব' আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভব, মুর্খদেবো ভব'। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমাদের দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে।"[২৭]

এইভাবে স্বামীজিকে ভালোভাবে পড়লে আমরা জানতে পারি তিনি যুকদের উদ্দেশ্যে কি কি বার্তা দিয়ে গেছেন। যুবকদের সৎ, চরিত্রবান এবং নিঃস্বার্থপর হতে হবে। নিয়মিত

পড়াশোনা, জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটাতে হবে; নিয়মিত ব্যায়াম, পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ার মাধ্যমে শারীরিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে এবং মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ এবং প্রার্থনার মাধ্যমে হৃদয়বত্তার বিকাশ ঘটাতে হবে। মনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতে হবে এবং সর্বদা চিন্তা, কথা, কাজে সামঞ্জস্য আনতে হবে। যুবকদের আত্মবিশ্বাসী ও ভয়শূন্য হতে হবে এবং যথার্থ মানুষ হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে হবে। স্বামীজির কথায়: "মানুষ হও রামচন্দ্র! অমনি দেখবে ওসব বাকি আপনা আপনি গড়গড়িয়ে আসছে। ও পরস্পরের নেড়িকুত্তোর খেয়াখেয়ি ছেড়ে সদুদ্দেশ্যে, সদুপায়, সৎসাহস, সদ্বীর্য অবলম্বন কর। যদি জন্মেছ তো একটা দাগ রেখে যাও।"[২৮]

তথ্যসূত্র:

১। "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা", ৬ষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন, কলকাতা, মুদ্রণ-১৯৯৭, পৃ. ৩৫৮
২। "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা", ৬ষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন, কলকাতা, মুদ্রণ-১৯৯৭, পৃ. ২৪০
৩। "স্বামী বিবেকানন্দ ও আমাদের সম্ভাবনা", শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল, ডিসেম্বর, ২০০৮, পৃ. ৬৯
৪। "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা", ৫ম খণ্ড, উদ্বোধন, কলকাতা, মুদ্রণ-১৯৯৭, পৃ. ২১৭
৫। "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা", ৯ম খণ্ড, উদ্বোধন, কলকাতা, মুদ্রণ-১৯৯৭, পৃ. ৪৭৩
৬। "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা", ৬ষ্ঠ খণ্ড ,উদ্বোধন ,কলকাতা৩০২.পৃ ,১৯৯৭-মুদ্রণ ,
৬। "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা", ৫ম খণ্ড২১৫ .পৃ ,১৯৯৭-মুদ্রণ ,কলকাতা ,উদ্বোধন ,
৮। "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা", ৭ম খণ্ড১৩৪.পৃ ,১৯৯৭-মুদ্রণ ,কলকাতা,উদ্বোধন ,
৯। "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা", ৬ষ্ঠ খণ্ডকল ,উদ্বোধন ,কাতা২৭১.পৃ ,১৯৯৭-মুদ্রণ ,
১০। "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা", ৭ম খণ্ড৩২৭.পৃ ,১৯৯৭-মুদ্রণ ,কলকাতা ,উদ্বোধন ,
১১। "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা", ২য় খণ্ড২২৯.পৃ ,১৯৯৭-মুদ্রণ ,কলকাতা ,উদ্বোধন ,
১২। "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা", ৫ম খণ্ড ,উদ্বোধন ,কলকাতা৭৯.পৃ ,১৯৯৭-দ্রণমু ,
১৩। "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা", ৫ম খণ্ড১৩৪.পৃ ,১৯৯৭-মুদ্রণ ,কলকাতা ,উদ্বোধন ,
১৪। "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা", ৭ম খণ্ড২৮৭.পৃ ,১৯৯৭-মুদ্রণ ,কলকাতা ,উদ্বোধন ,
১৫। "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা",১০ম খণ্ডকল ,উদ্বোধন ,কাতা১৪৩.পৃ ,১৯৯৭-ণমুদ্র ,
১৬। "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা", ৩য় খণ্ড৪৩৫.পৃ ,১৯৯৭-মুদ্রণ ,কলকাতা ,উদ্বোধন ,
১৭। "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা", ১ম খণ্ড১৫৩.পৃ ,১৯৯৭-মুদ্রণ ,কলকাতা ,উদ্বোধন ,
১৮। "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা", ২য় খণ্ডকলক ,উদ্বোধন ,াতা২২৯.পৃ ,১৯৯৭-ণমুদ্র ,
১৯। "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা",৬ষ্ঠ খণ্ড৪৩০.পৃ ,১৯৯৭-মুদ্রণ ,কলকাতা ,উদ্বোধন,
২০। "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা",৬ষ্ঠ খণ্ড৫০৬.পৃ ,১৯৯৭-মুদ্রণ ,কলকাতা ,উদ্বোধন ,
২১। "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা",৫ম খণ্ডকলকা ,উদ্বোধন ,তা২৮৩.পৃ ,১৯৯৭-ণমুদ্র ,
২২। "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা",৯ম খণ্ড২১৭.পৃ ,১৯৯৭-মুদ্রণ ,কলকাতা ,উদ্বোধন ,
২৩। "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা",৯ম খণ্ড১০৭.পৃ ,১৯৯৭-মুদ্রণ ,কলকাতা ,উদ্বোধন ,
২৪। "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা",৬ষ্ঠ খণ্ড৩২.পৃ ,১৯৯৭-মুদ্রণ ,কলকাতা ,উদ্বোধন ,
২৫। "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা",৬ষ্ঠ খণ্ড৩৫৮.পৃ ,১৯৯৭-মুদ্রণ ,কলকাতা ,উদ্বোধন ,
২৬। "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা",৬ষ্ঠ খণ্ড২৪৯.পৃ ,১৯৯৭-মুদ্রণ ,কলকাতা ,উদ্বোধন ,
২৭। "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা",৭ম খণ্ড,কলকাতা ,উদ্বোধন , মুদ্রণ৩০.পৃ ,১৯৯৭-
২৮। "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা",৬ষ্ঠ খণ্ড১৬২.পৃ ,১৯৯৭-মুদ্রণ ,কলকাতা ,উদ্বোধন ,

বাঁকুড়ায় বিজয়ার উৎসব

সুখেন্দু হীরা

বিজয়া দশমী হল দুর্গা বিসর্জনের তিথি। আশ্বিন শুক্লপক্ষীয় দশমী। দুর্গার এক নাম বিজয়া। দেবী পুরাণ মতে পদ্মনামা দৈত্যরাজকে জয় করেছিলেন বলে তার এই নাম। আবার পার্বতীর দুই সখীর নাম জয়া ও বিজয়া। এই দুই সখীকে অনেক জায়গায় দুর্গাপ্রতিমার সঙ্গে পূজা হতে দেখা যায়। কালিকা পুরাণে এক বিজয়ার উল্লেখ আছে। তিনি হলেন সতীর বোনঝি। সতীর পিতা দক্ষ যখন সর্ব-জীবন যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন তাতে তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে যাওয়ার পথে সতীর সঙ্গে দেখা করতে সতীর গৃহে যান। তখন সতী বিজয়ার কাছ থেকে 'দক্ষযজ্ঞে'র কথা জানতে পারেন এবং জানতে পারেন শিব এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত নন। তারপরের ঘটনা সবার জানা। এছাড়া ৬৪ যোগিনীর অন্যতম হলেন বিজয়া।

একদা শরৎ ঋতু দিয়ে বর্ষ শুরু হতো। আশ্বিন শুক্লা দশমী ছিল বর্ষের প্রথম দিন। তাই আমাদের দেশে বিজয়া দশমী ছিল নববর্ষ। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জাতি তাদের নতুন বছরের শুরুর দিন উৎসব করে থাকে। সেই নববর্ষের প্রথা এখনো পালন করে চলেছি

আমরা। যেমন নববস্ত্র পরিধান, আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে ভালোমন্দ খাওয়া দাওয়া, সারাদিন আমোদ-আহ্লাদে কাটানো। সবাই বিশ্বাস করে বছরের প্রথম দিন সুখে-সচ্ছন্দে কাটলে সারা বছর এই ভাবে কাটবে। কিন্তু এই দশমীর নাম কেন বিজয়া কেন? তার উত্তর প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতি গবেষক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি দিয়েছেন, "এই আমরা নববর্ষে বিজয় কামনা করি। এক বছর অতিক্রম করেছি, সকল কামনা সিদ্ধ হয় নাই, কত দুঃখ কষ্ট পেয়েছি, এই নূতন বৎসরে যেন আমাদের সকল কার্য সিদ্ধি হয়। এই আনন্দের দিনে কনিষ্ঠেরা গুরুজনদিগকে প্রণাম করে, নববর্ষে বিজয়লাভের জন্য তারা তাদের আশীর্বাদ চায়। বয়স্যরা পরস্পর আলিঙ্গন করে, একে অন্যের শুভ কামনা করে আহ্লাদ প্রকাশ করে।"

বিজয়ার অন্য অর্থ হলো সিদ্ধি বা ভাঙ্গ। দুর্গাপূজাতে বিজয়ার দিনে সিদ্ধি পান করার প্রথা আছে। যিনি পান করেন না তিনি স্পর্শ করেন। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে, আগে নববর্ষের আগের দিন রুদ্রদেবের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হতো। এখন আমরা রুদ্রাণীর পূজা করি। যিনি রুদ্রাণী তিনিই দুর্গা। তিনি সর্বদেবের সম্মিলিত শক্তি, তিনি মহাশক্তি। তাঁর নিকট আমরা প্রার্থনা করি, যেন নববর্ষে আমাদের বিজয় হয়। তিনি 'বিজয়া' নামের উৎপত্তির কারণে এই বলে সমাপ্তি টেনেছেন, "আশ্বিন শুক্ল-দশমীর নাম বিজয়া-দশমী হয়েছে সেদিন আমরা বিজয় কামনা করি, এই হেতু বিজয় কিংবা, সেদিন আমরা বিজয়া পান করি, এই হেতু বিজয়া নামের উৎপত্তি এই দুই-ই হ'তে পারে।"

শুধু বঙ্গদেশে নয় উত্তর ভারতে বিজয়া দশমী খুব উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়। পাঞ্জাবে এদিন বণিকেরা 'হালখাতা' করে। সেদিন দ্যুতক্রীড়া দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষা করে। উত্তর ভারতে বলে 'দশেরা'। সেখানে নবরাত্রি ব্রতের পর দশমীর দিন দশেরা। সেদিন রামলীলা, রাম-রাবণের যুদ্ধ, রাবণ বধ, সীতা উদ্ধার, রামের বিজয় যাত্রা ইত্যাদি অভিনয় করা হয়। অনেকে বলেন ত্রেতা যুগে রাম রাবণকে শুক্লা নবমীতে বধ করেছিলেন। এইজন্য দশমীতে বিজয় উৎসব। বাংলায় মহাকবি কৃত্তিবাস লিখেছেন ষষ্ঠীতে বোধন, আর দশমীতে রাবণ বধ। যাই হোক দশমীতে রামের এক নিবিড় যোগ দেখতে পাওয়া যায়। অনেক স্থানে রাবণ পোড়া অর্থাৎ রাবণের প্রতিমূর্তি তৈরি করে তাতে আগুন দিয়ে পোড়ানো হয়। পশ্চিমবঙ্গে খড়গপুর শহরে রাবণ পোড়া খুব বিখ্যাত। এছাড়া ঝাড়গ্রাম শহরেও রাবণ পোড়া হয়। বাঁকুড়া জেলাতে দু'একটি রাবণ পোড়া হদিস পাওয়া গেছে। এবারে বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি বিজয়া দশমীর উৎসবের বিবরণ দেওয়া হলো।

বৈতল ঝগড়াই চন্ডী মন্দিরে কাদা খেলা: উত্তর বাড় গ্রাম পঞ্চায়েত, জয়পুর থানা।

বৈতল গ্রামের "মা ঝগড়াই ভঞ্জনী" মন্দিরটি খুব প্রাচীন। প্রতিষ্ঠা লিপি অনুসারে ৯৬৫ মল্লাব্দে (১৬৫৯ খ্রীঃ) বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা প্রথম রঘুনাথ সিংহ কর্তৃক নির্মিত। মাকড়া পাথরের তৈরী সপ্তরথ দেউল। কিংবদন্তী আছে, চেতোয়া বরদার রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার সময় রাজা প্রথম রঘুনাথ সিংহ গভীর জঙ্গলে দেবীর দেখা পান। দেবীর আশীষে

যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তারপর এই মন্দির নির্মাণ করেছেন। ঝগড়া (যুদ্ধ) থেকে দেবীর প্রতিষ্ঠা বলে লোকমুখে দেবী "ঝগড়াই চন্ডী" নামে পরিচিত। তবে কোন বাদ-বিসম্বাদ থাকলে, মায়ের কাছে মানত করে গেলে সেই ঝগড়া মিটে যায়। এমনই বিশ্বাস এলাকাবাসীর। তাই মায়ের আরেক নাম ঝগড়াই ভঞ্জনী। এখানের দেবী প্রকৃতপক্ষে আদ্যাশক্তি মহামায়া অর্থাৎ মা দূর্গা। মায়ের এখানে শিলামূর্তি। মুখটুকু ছাড়া আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত। এই মন্দিরে দুর্গাপূজার সময় মায়ের পূজা হয় ধুমধাম করে। অবশ্য সারাবছর নিত্য পূজা হয়, ভাত ভোগ হয়। অন্যান্য পূজা সেরকম হয় না। মায়ের নামে বেশ জমি জায়গা ও পুকুর আছে। তাতেই মায়ের বছর কার ভরণপোষণ হয়ে যায়। বর্তমানে সেবায়েত রায় ও সন্তোষী পদবীর ব্রাহ্মণরা।

এখানে বিজয়া দশমীর দিন হয় 'কাদা খেলা'। মন্দিরের সামনে জায়গাটি চারধার মাটি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। এমনিতে মাঠটি সামান্য নীচু। তারপর সেই মাঠে সাতঘাটের জল এনে ঢালা হয়। পুরোহিত নিয়ে আসে আশেপাশের সাতটি পুকুরের জল। তবে বেশিরভাগ জলটা থাকে গ্রামের এক কিলোমিটার দূরবর্তী রাজার পুকুরের জল। এই পুকুরের জল বেশি আনার কারন এটিই নিকটবর্তী পুকুর। তারপর সেই বেধে দেওয়া জলে খেলতে নেমে পরে গ্রামের মানুষ জন। কিছুক্ষনের মধ্যে সেই "জলক্রীড়া" কর্দম ক্রীড়াতে পরিণত হয়। কারন এত লোকের দাপাদাপিতে অচিরেই সাত ঘাটের জল হয়ে ওঠে মা 'ঝগড়াই ভঞ্জনী'র কাদা। এই অনুষ্ঠানটি হয় দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। প্রথমে কিছু মহিলা ও শিশুরা খেলে নেয়, তারপর পুরুষেরা নামে।

এলাকার বাসিন্দাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম এই কাদা খেলার উৎস বা ইতিহাস কী? জনশ্রুতি অনুযায়ী, রাজা রঘুনাথ সিংহ যখন এই বনপথে যাচ্ছিলেন তখন একটি বালিকাকে অর্থাৎ দেবীকে জলক্রীড়া করতে দেখেছিলেন। যুদ্ধ জয় করে ফেরার সময় তিনি সেই স্থানে এসে কথা দিয়েছিলেন যে, এখানে মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করব এবং সেই সঙ্গে দশমীর দিন জলক্রীড়ার ব্যবস্থা করে দেবো।

এই কাদা খেলার একটি ব্যাখ্যা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। কালিকা পুরাণে বলা আছে-

বিসর্জয়েৎ দশম্যান্তু শ্রবণে শাবরোৎসবৈঃ।। ১৭।।

....

তদা সম্প্রেষণং দেব্যা দশম্যাং কারয়েদ্বুধঃ।। ১৮।।

সুবাসিনীভিঃ কুমারীভির্বেশ্যাভির্নর্তকৈ স্তথা।

শঙ্খতূর্যনিনাদৈশ্চ মৃদঙ্গৈঃ পটহৈস্তথা।। ১৯।।

ধ্বজৈর্বস্ত্রৈর্বহুবিধৈর্লাজপুষ্প প্রকীর্ণকৈঃ।

ধূলিকর্দমবিক্ষেপৈঃ ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ।। ২০।।

ভগলিঙ্গাভিধানৈশ্চ ভগলিঙ্গপ্রগীতকৈঃ।

ভগলিঙ্গাদিশব্দৈশ্চ ক্রীড়ায়েষুরলং জনাঃ।। ২১।।

পরৈর্নাক্ষিপ্যতে যস্তু য পরান্নাক্ষিপেদ্ যদি।

ক্রুদ্ধা ভগবতী তস্য শাপং দদ্যাং সুদারুণম্ ।। ২২।।

অর্থাৎ: দশমীর দিবস শ্রবণা নক্ষত্রে শারদোৎসবের সহিত দেবীর বিসর্জন করিবে। ----- জ্ঞানীব্যক্তি দশমীতে শ্রবণা নক্ষত্রে দেবীকে জলে প্রেরণ করিবেন। সুন্দর বস্ত্রে সজ্জিতা কুমারী ও বেশ্যা এবং নর্তকগণ সঙ্গে লইয়া শঙ্খ, তূরী, মৃদঙ্গ এবং পটহের শব্দ করিতে করিতে নানাবিধ বস্ত্রের ধ্বজা উড়াইয়া খই এবং ফুল ছড়াইতে ছড়াইতে ধূলিকর্দম নিক্ষেপ করতঃ নানা ক্রীড়াকৌতুক ও মঙ্গলাচরণপূর্বক ভগলিঙ্গাদিবাচক গ্রাম্যশব্দ উচ্চারণ ও তাদৃশ শব্দবহুল গান এবং তাদৃশ অশ্লীল বাক্যালাপ করিয়া বিসর্জনের সময়ে ক্রীড়া করিবে। সেই দিবস (অর্থাৎ বিজয়াদশমীর দিন) যদি কোনও মনুষ্য নিজের উপর অশ্লীল ব্যবহার করিতে না চাহে, অথবা যদি অন্যকে অশ্লীল ব্যবহারের দ্বারা আক্ষিপ্ত না করে, তবে ভগবতী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাপ প্রদান করিয়া গমন করেন।

চাতরা গ্রামে রঘুনাথ জীউয়ের রথযাত্রা: লেগো গ্রাম পঞ্চায়েত, কোতলপুর থানা।

চাতরা গ্রামে একটি প্রাচীন রঘুনাথ জীউ মন্দির আছে। এটি আসলে বৈষ্ণব নিম্বার্ক গোষ্ঠীর মন্দির। অর্থাৎ এটি একটি অস্থল। মল্লরাজ রাজবীর সিংহের মহিয়সী চূড়ামণি দেবী শ্রীক্ষেত্র পুরী গিয়ে সীতারাম দাস মোহন্তর কাছে দীক্ষা নেন। তিনি ফিরে এসে এখানে এক চত্বর জমি দান করেন মোহন্তদের। এই 'চত্বর' থেকে এই স্থানের নাম হয় চাতরা। তখন এক চত্বর জমির পরিমান ছিল ২০০-২৫০ বিঘা। বর্তমানে মন্দিরের নামে আছে ৩০/৪০ বিঘা জমি। এতেই বছর কার নিত্যসেবা কার্য চলে যায়। দশ জন মোহন্ত এসে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১০ জন মোহন্তের নাম উল্লেখ করে একটি ফলক আছে। শেষ মোহন্ত অযোধ্যা শরণ দেব মোহন্ত মারা গেছেন প্রায় ৩০ বছর আগে। বর্তমানে আর কোন সাধু নেই। গ্রামের ষোলআনা কমিটি এই অস্থলের দেখভাল করে। মন্দিরে দুর্গাপূজা করতেন শেষ মোহন্ত। ১৯৯২ সাল থেকে বর্তমান কমিটি নবকলেবরে দুর্গাপূজা শুরু করেছে। এই দূর্গা পূজার বিশেষত্ব হল দশমী থেকে তিনদিন রাবন কাটা রথযাত্রা। একটি কাঠের রথ মন্দিরের সামনে ছাউনিতে রাখা হবে। রথের দিন রঘুনাথজীউ রথে সওয়ার হন। রথের উচ্চতা ১০/১২ ফুট। বর্তমানে মন্দিরে আছে পিতলের প্রায় দুফুট উচ্চতার। আর আছে রাধা-কৃষ্ণ। সেই সময় কার রঘুনাথজীউয়ের মূর্তি আর নেই। কোথায় গেছে, তাও কেউ বলতে পারে না। বৈকালে রথ বেড়িয়ে গ্রাম ঘুরে মন্দিরে ফিরে আসে। দ্বিতীয় দিন ও একই রীতি। তৃতীয় দিন রথ ফেরার সময় মন্দিরের নিকটবর্তী

চাতরা রাম নারায়ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে থামে। এখানে থাকে মাটির তৈরি সাড়ে চার / পাঁচ ফুটের রাবণ। পানুয়ার শিল্পী যিনি দুর্গা প্রতিমা করে গড়ে দেন, তিনিই মাটির রাবণ তৈরি করে দেন। রাবনের সামনে রথ এসে দাড়ায়। গ্রামের মহাদন্ত পাড়ার কালীপদ সিংহ রাম সেজে রাবণ মূর্তির চারপাশে নৃত্যের ছন্দে যুদ্ধ করে। যুদ্ধ শেষে লোহার তরবারি দিয়ে মাটির রাবণকে বধ করে। এই উপলক্ষে ঐ স্কুল মাঠে তিনদিন মেলা বসে। রথ দেখা, রাবণ কাটা দেখা ও মেলা দেখা এই ত্রহ্যস্পর্শে মাঠ হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ।

তথ্যসূত্র: নিখিল কুমার পাল।

বাতিকরা গ্রামের দুর্গাপূজা: গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, হীড়বাঁধ থানা।

বাতিকরা একটি ছোট গ্রাম। পোস্ট শালুই পাহাড়ী। গ্রামে একটি দুর্গাপূজা হয়। পূজাটি সর্দারদের। অর্থাৎ ভূমিজদের। গ্রামে মাত্র ৭০ ঘর লোকের বাস। তার মধ্যে ৪০ ঘর সর্দার। বাকি ঘর গুলি ব্রাহ্মন, বৈষ্ণব, সহিস। পূজা করেন ব্রাহ্মন পুরোহিত। বর্তমানে পূজা পরিচালনা করেন বৃক্ষধর সিং সর্দার ও সুবল সিং সর্দার। পূজাকে সার্বজনীন করতে সর্দাররা অনিচ্ছুক। কারন এতে দেবীর কিছু অনিয়ম হতে পারে; এই রকমই বিশ্বাস ভূমিজদের। তবে পূজাটি সার্বজনীন রূপ পেয়েছে, পূজাটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন। দুর্গা ঠাকুরের একটি দালান মন্দির আছে। পূজা শুরু করেছিলেন বীর সিং সর্দার। প্রতিমা শিল্পী ফটিক কুম্ভকার। ইন্দপুরের ব্রাহ্মণডিহাতে বাড়ি। চাঁদা বাবদ কারো কাছে কিছু নেওয়া হয় না। কেউ দান করলে তা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়। পূজাতে নবমীর দিন ছাগ বলি হয়। আগে মানত থাকলে মহিষ বলিও হয়েছে। অষ্টমীর দিন আঁখ, কুমড়ো, শশা প্রভৃতি বলি হয়। বিজয়া দশমীর দিন আসে পাশের সাঁওতাল জাতির লোকেরা জড়ো হন নাচ করতে। ডুংরিগোড়া, ডাহিবাড়ি, তিলাবাইদ, ভীমপুর, দেউলভিড়া গ্রাম থেকে আদিবাসী নর-নারী চলে আসে বাতিকরা গ্রামে। সাঁওতাল পুরুষেরা গ্রাম ঘুরে দাঁসায় নৃত্য পরিবেশন করে। গৃহস্থ বাড়ি থেকে চাল, ডাল, কলা, লাউ, কুমড়ো ইত্যাদি আদায় হয়। তারপর পূজা মণ্ডপের সামনে নারী পুরুষ সমবেত ভাবে পরিবেশন করে করম নাচ, পাতা নাচ ইত্যাদি। দুপুর থেকে বিকাল নাচ গান করে সন্ধ্যায় তারা গ্রামে ফিরে যায়, এদের নাচ দেখতে প্রচুর লোকের সমাগম হয়। তখন গ্রামের রাস্তার দুপাশে মেলা বসে যায়। মেলাতে মিষ্টি, চপ, ঘুগনি, ফুচকা, খেলনা, মনোহারী দোকান থাকে।

পুখুরিয়া গ্রামে রাবণ পোড়া: পার্শ্বলা গ্রাম পঞ্চায়েত, সিমলাপাল থানা।

পুখুরিয়া গ্রামে একটি সার্বজনীন দুর্গা পূজা হয়। যার বয়স আনুমানিক পচাত্তর বছর। বর্তমানে পুখুরিয়া পূজা থেকে ভেঙে পাশের গ্রাম রেঙ্গুরবাঁধে কুর্মী গোষ্ঠী আলাদা করে দুর্গা পূজা করে। সিমলাপাল খাতড়া রোডের দক্ষিণ পাশে পুখুরিয়া, রেঙ্গুরবাঁধ, নিমডিহি পাশাপাশি গ্রাম। উত্তর দিকের গ্রামগুলি হল ফুলহরি, টিকান, গোলকপুর। এই গ্রামগুলি হল আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম। এই গ্রামের আদিবাসী স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই পুখুরিয়ার দুর্গাপূজাতে অংশগ্রহণ করে। এরা নবমীর দিন এসে সারাদিন নাচ গান করে। এদের

পূজার সময় বিখ্যাত নাচ দাঁসায়। যাতে ছেলেরা অংশগ্রহণ করে। রঙিন শাড়ি ধুতির মতো পড়ে, মাথায় পাগড়ি বেঁধে, তাতে ময়ূরের পালক গুঁজে গৃহস্থের বাড়িতে ঘুরে ঘুরে দাঁসায় নৃত্য পরিবেশ করে। ধামসা মাদলের পরিবর্তে নেয় বুয়াং (ভুয়্যাং) বাজনা। সঙ্গে থাকে বাঁশি ও কাঁসর ঘন্টা। দশমীর দিন আদিবাসীরা একটি নিজস্ব ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। তার নাম 'ভেজাবিঁধা'। একটি কলাগাছের কাণ্ডে দূর থেকে তীর ছুঁড়ে বিদ্ধ করা হয়। পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় ধুতি, গেঞ্জি, গামছা, চিড়ে, মিষ্টি। যিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন, তাকে বাকি প্রতিযোগীরা কাঁধে করে পূজা মণ্ডপে নিয়ে আসেন। এই কাঁধে করে আনাটা খুব সম্মানের ব্যাপার। এই প্রতিযোগিতা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। সাত-আট বছর আগে থেকে এই 'ভেজাবিঁধা'র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শুরু হয়েছে 'রাবণ পোড়া'। ১০/১২ ফুট উঁচু একটি রাবণের মূর্তি তৈরি করা হয় বাঁশ, খড় ও কাগজ দিয়ে। রাবণের মাথাগুলি হয় ঝুড়ি দিয়ে। তৈরি করে গ্রামের যুবা ছেলেরা। তারপর তীর ছুড়ে আগুন ধরানো হয়। দশমীর সন্ধ্যাবেলা হয় এই অনুষ্ঠান। গ্রামের লোকেরা এই অনুষ্ঠান খুব উপভোগ করে। এজন্য ভালোই ভীড় হয়।

বড়জোড়া গ্রামে বিজয়া দশমী মেলা: বড়জোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, বড়জোড়া থানা।

দুর্গাপূজা বাঙালীর জীবনে এক আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে। বিজয়া নিয়ে আসে বিষাদ। কিন্তু বড়জোড়া গ্রামে বিজয়ার দিন থাকে বাড়তি আনন্দ। এদিন বড়জোড়া গ্রামে বসে বিজয়া দশমীর মেলা। গ্রামে সার্বজনীন ও পারিবারিক মিলিয়ে ২৯ টি প্রতিমা হয়। এইসব প্রতিমা রাজারবাঁধ নামক পুকুরের সামনে, বড়জোড়া ফুটবল গ্রাউন্ডের মাঠে। দুপুর থেকে জড়ো হওয়া শুরু হয়। ঠাকুর মাঠে নামিয়ে সবাই মেলা ঘোরে। এই উপলক্ষে মাঠে মেলা বসে যায় যে। মেলা পরিচালনা করে বড়জোড়া গ্রাম ষোলআনা। এটা প্রায় ৪০ বছরের পুরনো প্রথা। মেলাতে খাবার দোকান বেশি থাকে। বিভিন্ন ক্লাব ঠাকুর আনার সময় বাজনা বাজিয়ে আসে। রাত আটটা থেকে ঠাকুর বিসর্জন শুরু হয় রাজারবাঁধে। ষোলআনার তরফ থেকে থাকে আতশবাজি প্রদর্শনী। স্থানীয় রাজ ক্লাব গত চার-পাঁচ বছর ধরে তারা 'রাবন পোড়া'র ব্যবস্থা করেছে। ১০/১৫ ফুট একটি বাঁশ ও খড় দিয়ে কাঠামো করা হয়। হাড়ি দিয়ে রাবণের দশ মাথা তৈরী করে। তাতে থাকে বাজি ঠাঁসা। আগুন জেলে রাবণ সশব্দে জ্বলে ওঠে। রাত দশটা/এগারোটা পর্যন্ত চলে বিসর্জন প্রক্রিয়া। ।

শুশুনিয়া অঞ্চলের আদিবাসী সাঁওতালদের জীবন ও সংস্কৃতি

সৌমেন রক্ষিত

আদিবাসী অর্থে আদি বাসিন্দা। ভারতের আদিবাসীদের চিহ্নিত করতে প্রধান যে দুটি পথ উন্মুক্ত তা হল ভাষাগত বিচার ও নৃতাত্ত্বিক বিচার। ভারতে যে চারটি প্রধান ভাষাবংশ রয়েছে, তার অন্যতম ভাষাবংশটি হল অস্ট্রিক। এটিই ভারতের প্রাচীনতম ভাষাগোষ্ঠী। ভারতে প্রচলিত অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়— ক) মোন্-খমের, এই ভাষায় কথা বলেন আসামের খাসিয়া উপজাতির লোকেরা। এবং খ) মুণ্ডারী গোষ্ঠীর ভাষাসমূহ। এর অন্তর্গত খারওয়ারি, কুরকু, খরিয়া, জুয়াং, শবর ও গডাবা। খারওয়ারি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষাগুলি হল—সাঁওতালি বা হড়, মুনারি, ভূমিজ, বিরহড়, কোডা, হো, তুরিম, আসুরি, আগারিয়া ও কোরওয়া। বাঁকুড়ায় অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত বেশ কিছু ভাষার মানুষের বাস লক্ষ করা যায়। আবার নৃতাত্ত্বিক বিচারে ভারতের জনগণকে যে পাঁচটি নরগোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়, তার মধ্যে প্রাচীনতম নরগোষ্ঠী হিসেবে ধরা হয় প্রটো-অস্ট্রালয়েড (Proto-Australoid) বা আদি-অস্ত্রাল। এদের একসময় বিস্তার ছিল উত্তর ভারত থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত। নৃতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন, এরা ভারত থেকে ইন্দোনেশিয়া হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছায়। আদি-অস্ত্রালদের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষদের মিল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে খুঁজে পাওয়া যায়। যদিও রিসলে ও

ডাল্টন সাঁওতাল উপজাতির উদ্ভব দ্রমিল জাতি থেকে বলে মনে করেন। বাঁকুড়া জেলার আদিবাসীরা হলেন মূলত সাঁওতাল, ভূমিজ, কোড়া প্রভৃতি উপজাতির মানুষ। তবে এদের মধ্যে সর্ববৃহৎ জনগোষ্ঠী অবশ্যই সাঁওতাল জনজাতি। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে তাঁদের দীর্ঘদিনের বসবাস। শুশুনিয়া অঞ্চলেও এদের বসবাস সুপ্রাচীনকাল থেকেই।

শুশুনিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত যে কয়েকটি গ্রাম আছে তার মধ্যে বাগডিহা, ভরতপুর, বিশকোদর, গিধুরিয়া, গোয়ালডাঙ্গা, হাপানিয়া, জলজলিয়া বানশোল, রামনাথপুর, শুশুনিয়া পড়শিবনা, শিউলিবনা ইত্যাদি গ্রামগুলোতে কম-বেশি সংখ্যক আদিবাসীদের বাস। জনগণনা-২০১১ অনুযায়ী গিধুরিয়ায় আদিবাসীদের সংখ্যা ৬৫৫, রামনাথপুরে ৬৩৯, বাগডিহায় ৫৩৯, শিউলিবনায় ৪০৬, বিশকোদরে ৩৯০, হাপানিয়ায় ২৫৭, গোয়ালডাঙ্গায় ২৫৩, পাহাড়বেদ্যায় ১৭৮, ভরতপুরে ৮৯। আদিবাসী বলতে প্রধানত সাঁওতাল জনজাতির প্রাধান্যই লক্ষ করা যায় এই এলাকায়। এছাড়াও আছে মাহালি ও করঙ্গা সাঁওতালদের প্রধান বারোটি গোত্র বা পারিস হল—হাঁসদা, মুর্মু, কিস্কু, হেমব্রম, মাণ্ডী, টুডু, বাস্কে, বেশরা, পাঁউরিয়া, চঁড়ে ও বড়য়া বা বেডেয়া। এরমধ্যে শেষের কয়েকটি বাদ দিয়ে বাকি প্রায় সব গোত্রের সাঁওতাল এই এলাকায় বসবাস করেন। তাঁদের সংস্কার, রীতি-নীতি জেলার অন্যান্য সাঁওতালদের মতোই।

জন্ম সংস্কার: সাঁওতাল বাড়িতে কোনো সন্তানের জন্ম হলে ঐ বাড়ি ও পাড়া-পড়শি 'অশৌচ' পালন করেন। লায়া এসে শুদ্ধিকরণের কাজ করেন। জন্মের তিন বা পাঁচদিন পর তিতা ভাত খাওয়ার অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে নাপিত প্রথমে লায়াকে, পরে বাকি পুরুষদের দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে দেয়। পরে নবজাতক বা নবজাতিকার মাথা থেকে এক গোছা চুল কেটে একটা পাতায় রেখে তাতে সামান্য তেল দিয়ে ধাত্রী বা ধাইমাকে দেন। প্রত্যেকের স্নান হওয়ার পর বুকে আতপ চালের গুঁড়ি মাখেন। ধাত্রী এক গোছা সুতোকে হলুদ-জলে মাখিয়ে সন্তানের কোমরে বেঁধে দেন। সাত দিনের দিন নবজাতকের মা সবার সঙ্গে স্নান করতে পারেন। গর্ভাবস্থায় সাঁওতাল রমণীকে কঠোর নিয়ম পালন করতে হয়। পাতা সেলাই করা, উনুন তৈরি করা চলে না এই সময়। নদী, খাল, ঝর্ণা ইত্যাদি পার হওয়া চলে না ইত্যাদি। নবজাতকের নামকরণের অনুষ্ঠানকে বলা হয় ছাতিয়ার। যদি জাতক প্রথম সন্তান হয়, তাহলে তার নাম তার ঠাকুরদাদার নামে হয়, জাতিকা হলে তার ঠাকুমার নামে হয়। অনুষ্ঠানে সন্তানের পিতা না থাকলে প্রসূতির বাবার মত অনুসারে নামকরণ হয়। তবে এখন আর এই নিয়ম সকলেই মানেন না। এরপর পাড়া-পড়শিদের তিতা ভাত অর্থাৎ নিমপাতা মিশ্রিত ভাত খাওয়ানো হয়। জাতকের খাটের নিচে সবসময়ের জন্য তীর ধনুক ও কাস্তে রাখা হয়। জাতিকা হলে রাখা হয় কাস্তে ও কাজললতা। আদিবাসী সমাজ মনে করে, এগুলি জাতক ও প্রসূতিকে অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা করে। এরপরের অনুষ্ঠান মুখে ভাত বা অন্নপ্রাশন। জাতকের ছয় মাস বয়সে এবং জাতিকার সাত মাস বয়সে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান হয়।

বিবাহ সংস্কার : আদিবাসী সমাজে বরের পক্ষ থেকে কন্যা খোঁজা হয়। সমগোত্রের মধ্যে বিয়ে হয় না। হিন্দুদের মতোই বিয়ের পর মেয়েদের গোত্র ও পদবি

পালটে যায়। বহু বিবাহ নেই, বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে। বরপণ নেই। বিবাহ-বিচ্ছেদের নিয়ম আছে। স্ত্রীর মৃত্যু হলে ছোট শালীকে বিয়ে করার বিধান আছে। গোত্র অনুযায়ী বিবাহে বাধা-নিষেধও লক্ষ করা যায়। যেমন বেশরাদের সঙ্গে টুডুদের বা কিস্কুদের সঙ্গে মাণ্ডিদের বিবাহ হয় না। ড. অতুল সুরের মতে, সাঁওতাল সমাজে প্রধানত তিন রকমের বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত—ক) ঘটকালী পদ্ধতি, খ) সিঁদুর-ঘষা পদ্ধতি এবং গ) নিরবোলক পদ্ধতি। ঘটকালী পদ্ধতিতে ঘটক পাত্রের কাছে বিভিন্ন পাত্রীর সম্বন্ধ নিয়ে আসেন। পছন্দ হলে বিয়ে হয়। সিঁদুর-ঘষা পদ্ধতিতে, যদি কোন পুরুষ প্রকাশ্য কোন স্থানে কোন মেয়ের সিঁথিতে সিঁদুর ঘষে দেন, তাহলে সে বিবাহকে মান্যতা দেওয়া হয়। নিরবোলক পদ্ধতির বিবাহ হল, মেয়ে তার পছন্দমতো ছেলের বাড়িতে গিয়ে একপ্রকার জোর করে থাকতে শুরু করে। তবে শুশুনিয়া অঞ্চলে ঘটকালী পদ্ধতিতেই সবচেয়ে বেশি বিবাহ হয়। ভালোবেসে বিয়ে করার আধিক্যও ক্রমশ বাড়ছে আদিবাসী সমাজে। অন্যভাবে, সাঁওতালদের বিয়ের প্রথা বা 'বাপ্‌লা'কে সাতভাবে ভাগ করেছেন অনেকে—১। কিরিঞ বাহু বাপ্‌লা—বর ও কনে দুই পক্ষের মধ্যে দেখাশুনা করে যে বিয়ে হয়। ২। টুড'কি বাহু বাপ্‌লা—কনের বাড়িতে বিয়ের আয়োজন না করা গেলে বরের বাড়িতে কনেকে এনে যে বিয়ে হয়। ৩। অর্ আদের বাপ্‌লা—কুমারী মেয়েকে জোর করে ধরে এনে যে বিয়ে। ৪। ঞিব বল বাপ্‌লা—পরস্পর ভালোবেসে যে বিয়ে। ৫। ইত্যুৎ সিন্দুর বাপ্‌লা—যুবক যুবতী পরস্পর ভালোবেসে বিয়ে করতে চাইলে যদি মেয়ের বাবা বাধা দেয়, সেক্ষেত্রে গ্রামের মঁড়ে হড় বা গ্রাম পঞ্চায়েত বিয়ের ব্যবস্থা করে। এই বিয়েকে ইত্যুৎ সিন্দুর বাপ্‌লা বলে। ৬। সাঙ্গো বাপ্‌লা—কোন বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা মেয়ের বিয়েকে সাঙ্গা বলে। ৭। কিরিঞ জাওয়ায় বাপ্‌লা—কুমারী মেয়ে যদি অন্তসত্ত্বা হয় এবং দোষী পুরুষকে খুঁজে না পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে ইচ্ছুক যেকোন পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। এই বিয়েকে কিরিঞ জাওয়ায় বাপ্‌লা বলে।

বিয়ের জন্য পাত্র-পাত্রী নির্ধারিত হয়ে গেলে পাত্রপক্ষ ভালো দিন দেখে পাত্রীর বাড়ী যায়। তবে সেটা বিজোড় সংখ্যায় অর্থাৎ ৩,৫ বা ৯ বা ১১ জন মিলে যায়। পাত্রপক্ষ পাত্রীপক্ষের বাড়িতে বা উঠোনে বসলে সেখানে জলপূর্ণ ঘট রাখা হয়। এই ঘট শুভ বা ভালো কিছু ঘটনার প্রতীক। অবশেষে বিয়ের দিন ধার্য করা হয়। পূর্বে দুটি দড়িতে গিঁট দিয়ে বিয়ের দিনকে সুনিশ্চিত করা হত এবং দুই পক্ষকে সেই দড়ি দেওয়া হত। যেমন বিয়ের আর কুড়িদিন দেরি হলে দড়িতে কুড়িটা গিঁট দেওয়া হত। প্রতিদিন একটি করে গিঁট খুলতে হত। বর্তমানে ক্যালেন্ডারের সুপ্রচলনের জন্য এই ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। বিয়ের দু-একদিন পূর্বে হয় গায়ে হলুদ বা গাত্রহরিদ্রা। বিবাহ অনুষ্ঠান যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেজন্য জাহের থানে গিয়ে পুজো দেওয়া হয়। পাত্রের বাড়ির উঠোনে দুটি গর্ত করা হয়। ছোট গর্তটিতে কাঁচা হলুদ, পাঁচটি কড়ি বা মুদ্রা, পাঁচটি ধান, কয়েকটি দুর্বাঘাস, আতপ চাল একটি শালপাতায় মুড়ে রেখে দেওয়া হয়। বড় গর্তটিতে একটি সতেজ শাল ডাল, একটি মহুল ডাল, একটি চিরুডাল, দুর্বাঘাস, আতপ চাল বনখেজুরের চাটাই দিয়ে বেঁধে খড় দিয়ে জড়ানো হয়। তারপর তাতে মাটি লেপে সমান করে একটি মণ্ডপ তৈরি

করা হয়। লায়া ও জগমাঝি ঐ ডালগুলিকে পুজো করেন। তারপর কাঁচা হলুদ বেঁটে সরষের তেলের সঙ্গে মেশানো হয়। সেই তেল হলুদ গায়ে মাখানো হয়। বরের গায়ে দেওয়া হলুদ তেল কনের বাড়িতে পাঠানো হয়। কনে সেই হলুদ-তেল মাখেন। বিয়ের দিন বাড়িতে একটি ছোট্ট খাল কাটা হয়, পুকুরের প্রতীক হিসেবে। এখানে পাত্রকে স্নান করানো হয়। একটি জোয়ালের ওপর প্রথমে পাত্রের বাবা, তারপর পাত্রের মা, শেষে পাত্র দাঁড়ান। একটি তরবারি নিয়ে পাত্রের বাবার মাথা থেকে পাত্রের মাথা পর্যন্ত রাখা হয়। তাতে পাত্রের বাবার মাথায় থাকা তরবারির হাতলের ওপর এমনভাবে জল ঢালা হয় যাতে তরবারি দিয়ে সেই জল পাত্রের মাথায় গিয়ে পড়ে। বিকেলের দিকে নিকটবর্তী পুকুরে বা নদীতে জল আনতে যাওয়া হয়। বিয়ের সময় পাত্রকে কাঁধে নেন পাত্রের ভগ্নিপতি বা বামুন। কনেকে নিয়ে আসা হয় বড় ডালা বা চাঙ্গারিতে। বর-কনের শুভদৃষ্টির পর সিঁদর দান হয়। এভাবেই বিয়ের কাজ সেদিনের মতো শেষ হয় এবং সকলে সম্মিলিতভাবে নাচ-গানে লিপ্ত হয়। এই অনুষ্ঠানকে বলে 'সিঁদুর লেবেদ লটম'। সকলে এই সময় 'হরিবোল' বলে চিৎকার করে ওঠেন। বিয়ের পরের দিন হয় কনে বিদায় পর্ব। সাঁওতাল সমাজের বিবাহ অনুষ্ঠান অনেকটাই হিন্দু রীতির। তবে তাঁদের বিয়েতে কোনো মন্ত্র পড়া হয় না।

মৃত্যু সংস্কার : সাঁওতালদের মৃত্যু সংস্কার প্রায় হিন্দুদের মতোই। অন্নপ্রাশনের পূর্বেই কোন জাতক মারা গেলে মৃতদেহকে মাটিতে পোঁতা হয়। অন্য ক্ষেত্রে মৃতদেহকে দাহ করা হয় বা কবর দেওয়া হয়। মৃতদেহকে শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়ার সময় খই ও কার্পাসের বীজ ছড়ানো হয়। শ্মশানযাত্রীরা স্নান করে বাড়ি ফিরে এলে একটি বাচ্চা মুরগি কেটে তার ডানা ও পায়ের নখ আলাদা করে চালের সঙ্গে রান্না করা হয়। সঙ্গে দেওয়া হয় আম। নুন বা তেল দেওয়া হয় না সেই মাংস রান্নায়। তারপর একটি শালপাতায় সেই রান্না বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে শ্মশান যাবার রাস্তায় একটি ছোট্ট চালা করে তাতে রাখা হয়। সেখান থেকে ফিরে আসার পর ঘরের ভেতরে একটি কুলায় আতপ চাল ও খুদ রাখা হ্য। এটি আসলে মানুষটির মৃত্যুর কারণ জানার জন্য একটি সংস্কার। এইসময়েই শবদাহকারীদের একজনের ওপর (মূলত মুর্মু গোত্রের কোনো লোকের ওপর) 'ভর' হয়। সে তখন মৃতের সম্পর্কে অনেক কথা বলে। তাকে পবিত্র হাঁড়িয়া পান করতে দেওয়া হয় যাতে তার মধ্য দিয়ে বিদেহী আত্মা ঐ হাঁড়িয়া পান করে। মৃতের নিকট আত্মীয়েরা ৫ দিন অশৌচ পালন করেন এবং ছয় দিনের দিন চুল-নখ-দাড়ি কামিয়ে শৌচ হন। শ্রাদ্ধের দিন মারাং বুরুর পুজো দেওয়া হয়। পুজোতে মুরগী বলিও দেওয়া হয়। সেদিন স্নানের সময় পরিবারের সবাই এঁটেল মাটি ও মহুয়ার খইল মাখেন। শুশুনিয়া এলাকার আদিবাসীরা মৃতদেহের অস্থি মূলত দামোদর নদের জলে ভাসিয়ে দেন। কেউ দামোদর না যেতে পারলে নিকটবর্তী নদীতে ভাসিয়ে দেন। এখানকার আদিবাসী সমাজে পটুয়াদের আগমন ও চক্ষুদান প্রথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিকটবর্তী ভরতপুর ও কালিপাহাড়ি গ্রামের পটুয়ারা মৃতদেহের পরিবারে এসে পট দেখিয়ে মৃতদেহের চক্ষুদান করেন। প্রচলিত, এতে মৃতদেহের আত্মা শান্তিলাভ করে।

বিচার ব্যবস্থা : আদিবাসী সমাজের বিচার ব্যবস্থা তাঁদের উন্নত জনজীবনের পরিচয়বাহী। মঁড়ে হড় অর্থাৎ পাঁচ জন মুখ্য ব্যক্তির ওপর কোনো গ্রামের বিচার ব্যবস্থা ন্যস্ত থাকে। প্রধান বিচারপতি হন মাঝি অর্থাৎ গ্রাম প্রধান। মাঝির সঙ্গে থাকেন জগ মাঝি বা গ্রাম উপপ্রধান, গোড়েৎ, নায়কে এবং পরানিক। জগ মাঝি গ্রামের উৎসব-অনুষ্ঠানের বিষয়গুলি দেখেন। গোড়েৎ এর কাজ বিবাদের তথ্য সংগ্রহ করা বা গ্রামে নিমন্ত্রণের কাজ করা। সাঁওতাল সমাজে পুরোহিতের কাজ করেন নায়কে। শুশুনিয়া অঞ্চলে এখনো এরূপ বিচার ব্যবস্থার প্রচলন আছে। সাঁওতাল সমাজে যে সব পদাধিকারীদের কথা জানা যায়, তারা মূলত নিম্নরূপ—

ক) মাঝি—আদিবাসী গ্রামের সর্বোচ্চ আসনে ইনি অধিষ্ঠিত। মূলত যিনি প্রথম কোথাও গ্রাম স্থাপন করেন, তিনিই মাঝি হন। পরে বংশানুক্রমে সেই পদ চলে। মেয়েরা এই পদের অধিকারী হতে পারে না।

খ) পারাণিক—ইনি মাঝির সহায়ক। কোন মাঝি অপুত্রক বা ভ্রাতাহীন হলে তাঁর মৃত্যুর পর পারানিক-ই মাঝি হন।

গ) জগমাঝি—গ্রামের তরুণ-তরুণীদের কাজকর্ম ও চারিত্রিক দিক দেখেন জগমাঝি। গ্রামের কোনো যুবক বা যুবতী কাউকে ভালোবাসলে সে খবর প্রথমে জগমাঝিকে জানাতে হয়। জগমাঝি তখন গোডেৎকে জানিয়ে সভা ডাকার নির্দেশ দেন।

ঘ) জগ পারাণিক—ইনি পারাণিকের সহায়ক। জগমাঝির অনুপস্থিতিতে তিনি জগমাঝির দায়িত্ব পালন করেন।

ঙ) ভদ্দ—গ্রামের শাসন ব্যবস্থা ঠিকঠাক চলছে কিনা তা দেখার জন্য থাকেন একজন ভদ্দ।

চ) নাইকে বা নায়কে—মাঝির ছোট ভাই এই পদ পান। ইতি সাঁওতালদের পুরোহিত। এই পদটিও বংশানুক্রমিক।

ছ) গোডেৎ—গ্রামের বিভিন্ন খবরাখবর গ্রামবাসীর কাছে পৌঁছে দেন এই গোডেৎ।

জ) দিশম মাঝি—সমস্ত সাঁওতাল সমাজের প্রধান হলেন দিশম মাঝি। তিনি মহারাজাতুল্য।

ঝ) কুডাম নাইকে—ইনি সাধারণত ডাইনি শ্রেণির দেবদেবী বা অপদেবতার পূজা করেন। এই পদ বংশানুক্রমিক।

ঞ) দেশকোটাল—এনার কাজ অনেকটা গোডেৎ এর মতো। তবে গোডেৎ কেবল গ্রামের মধ্যেই খবর বা নির্দেশ জানিয়ে দেন প্রত্যেককে। দেশকোটালের কাজ হল বিচারসভার খবর সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলির মাঝিদের কাছে পৌঁছে দেন। দুই বা তার বেশি গ্রামের মধ্যে বিবাদ হলে তা সমাধানের জন্য পাশাপাশি কয়েকটি গ্রামের পারগানাদের নিয়ে বিচারসভা বসানো হয়। এই ক্ষেত্রে সংবাদ বা নির্দেশ প্রেরণের জন্য দেশকোটালের ভূমিকা থাকে।

শিকার উৎসব: সাঁওতালদের অন্যতম উৎসব শিকার উৎসব বা মারাং বুরু সেন্দ্রা। সাধারণত বৈশাখী পূর্ণিমার দিন এই উৎসব হয়ে থাকে। এই অঞ্চলের সাঁওতালরা শুশুনিয়া পাহাড়ে এই উৎসব পালন করেন। শুশুনিয়া থেকে শিঁউলিবনা যাবার রাস্তার মুখেই আছে আদিবাসীদের পবিত্র দেবস্থল। সেখানে পুজো দিয়ে প্রণাম করে এই এলাকার সাঁওতালরা শিকারে বের হন। শিকার শেষে আবার তারা এই জায়গায় এসে মিলিত হন। শিকারীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে শুশুনিয়া পাহাড়ের ওপরের দিকে উঠতে থাকে। বর্তমানে তারা কিছু ছোট ছোট প্রাণী ও পাখি শিকার করে থাকেন। সমগ্র শিকার উৎসবটি বেশ কিছু পালনের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ হয়। পূর্ণিমার আগের দিন রাতে জলপূর্ণ পিতলের কলসিতে শালগাছের দুটি ছোট ছোট ডাল ডুবিয়ে রাখা হয়। ভোরবেলায় সেই ডালগুলি তুলে 'দিহরি' শিকারের ক্ষণ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন। পাশাপাশি গ্রামের মোড়লদের শাল গাছের ডাল পাঠিয়ে আগে থেকেই শিকারের দিন-ক্ষণ ও মিলন স্থল জানিয়ে দেন। একে বলা হয় 'শাল-গিরা'। সেইমতো শিকারের দিন একটি নির্দিষ্ট জাহের থানে সকলেই জড়ো হন। জাহের থানে দেবতাদের উদ্দেশ্যে পূজা ও প্রণাম সেরে যুবকেরা তীর, ধনুক, বল্লম ইত্যাদি অস্ত্র নিয়ে শিকারে যাবার জন্য প্রস্তুত হন। বাড়ির মহিলারা পুরুষদের জন্য মহুয়ার মোয়া সহ বিভিন্ন রান্না করে নিয়ে আসেন। পুরুষদের শিকার থেকে না ফিরে আসা পর্যন্ত মহিলাদের নানারকম নিয়ম পালন করতে হয়। যেমন, স্ত্রী হাতের শাঁখা ও কপালে সিঁদুর পরবে না, বিশেষ কাজ ছাড়া গ্রামের বাইরে যাবে না ইত্যাদি। শিকারে যাবার আগে পুরুষেরা স্ত্রীর হাতের বালা খুলে নেন এবং স্ত্রীর দেওয়া খাবার বেঁধে রওনা দেন। স্ত্রী স্বামীকে ফিরে আসার পথে 'মারাড় বাহা' ফুল আনতে বলেন।

সাঁওতাল সমাজে শিকার উৎসবের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। একটি হল নিকটবর্তী জঙ্গল থেকে হিংস্র প্রাণীদের তাড়িয়ে নিজেদের আশ্রয়স্থলকে নিরাপদ করা। একে বলা হয় 'ল বির সেঁদরা'। এবং অন্যটি হল এই শিকার উৎসবেই তাঁদের সর্বোচ্চ বিচারসভা বসে। একে বলা হয় 'ল বির বায়সি'। শিকার উৎসবের প্রধান আয়োজক বা আহ্বায়ক বা পরিচালক হলেন 'দিহরি'। ইনিই এই উৎসবের সর্বময় কর্তা। শিকারের শেষে যে বিচারসভা বসে তার সভাপতিত্বও করেন এই দিহরি। শিকার শেষ হলে পূর্ব নির্ধারিত 'গিপিতিচ' বা সুতান টাণ্ডি বা শিকার শেষের মিলন স্থলে সবাই মিলিত হন। সেখানে শিকারের মাংস রান্না করে সবাই মিলে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া চলে। তারপর চলে বিচার সভা। গ্রামের অমীমাংসিত বিচার থাকলে এদিন তার আপীল ও পুনর্বিচার হয়। আবার শিকার চলাকালীন কোনো বিবাদ উপস্থিত হলে সেগুলিও এখানে বিচার করা হয়। তারপর চলে নাচ গানের আসর। সব শেষে ভোরের আলো দেখা দিলে যে যার বাড়ির দিকে রওনা দেয়।

ভ্যাজা বিঁধা: সাঁওতাল জাতির একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হল ভ্যাজা বিঁধা। মাঠের একদিকে সাঁওতাল যুবকেরা তীর ধনুক নিয়ে বসে থাকেন। অন্যদিকে থাকে একটি নির্দিষ্ট খুঁটি বা কলা গাছ। সেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে ভেদ করতে হয়। যিনি পারেন, তাকে ফুলের

মালা, বস্ত্র দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়। ভরতপুর যাবার রাস্তায় শুশুনিয়া পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ফাঁকা মাঠে ভ্যাজা বিঁধা অনুষ্ঠান হত।

খেরওয়াল তুকৌ : আদিবাসীদের পাতা পরব ধূমধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। শুশুনিয়া অঞ্চলের শিউলিবোনায় প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারি এই অনুষ্ঠান হয়। পুরো মাঠ জুড়ে কাগজের শিকল ও পাতাকা করে ছাইয়ে দেওয়া হয়। বাঁশের তোরণও করা হয়। শুশুনিয়া পাহাড়ের কোলে অনুষ্ঠিত এই পরব অন্যতম আকর্ষণের বিষয়। এটিকে বলা চলে আদিবাসীদের মিলন মেলা। শিউলিবোনার প্রায় ৬৫ টি পরিবার এই অনুষ্ঠানটিকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে এই মেলার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। দিনরাত ধরে হয় বাহা নাচ, লাগড়ে, সহরায়, নাটুয়া নাচ, কোরাস নাচ ইত্যাদি। পাহাড়বেদিয়া, শিউলিবোনা, বামুনডিহা, রামনাথপুর, শুয়াবাসা, বালিখুন, মাহালি, বাবলাডাঙ্গা, যাদবপুর, গিধুরিয়া, বাঁকাজড়িয়া, হাড়িভাঙ্গা ইত্যাদি পাশাপাশি আদিবাসী গ্রামগুলির শিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। শুধু জেলার আদিবাসী গ্রামের শিল্পীরা-ই নয়, বরং রাজ্যের বাইরে থেকেও বিভিন্ন শিল্পীর দল আসে এই মেলায় তাঁদের শিল্প প্রদর্শন করতে।

সহরায় : সাঁওতালদের অন্যতম উৎসব সহরায় বা সরহায়। কালীপূজার পরদিন থেকে পাঁচদিন অনুষ্ঠিত এই উৎসব বাঁদনা পরবের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। এই পরবের প্রথম দিন 'উম' অর্থাৎ শুভ সূচনা। নাইকে তার সহকারীকে নিয়ে পুজোর যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রকৃতির দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য 'গড়টেন্ডি' বা ময়দানে এসে উপস্থিত হন। সেখানে থাকে আতপ চাল, সিঁদুর, মুরগির ছানা, চাল বাখর মিশ্রিত পবিত্র পানীয় 'হেন্ডি' বা হাঁড়িয়া। মাঠে একটু অংশ জুড়ে নাইকে পুজোর 'থান' তৈরি করেন, যেখানে এই পবিত্র জিনিসগুলি রাখা হয়, সেই মণ্ডপটিকে বলা হয় 'খটঁ'। সেখানে মুরগির ছানাগুলিকে বলি দিয়ে তার রক্ত মণ্ডপে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। পরে আতপ চাল ছড়িয়ে দেওয়া হয় ও মণ্ডপে সিঁদুর লেপন করা হয়। এরপর দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানান উপস্থিত সবাই। তারপর সেখানে সকলের দেওয়া চাল ও অন্যান্য উৎসর্গীকৃত দ্রব্য মাটির হাঁড়িতে রান্না করা হয়, যাকে বলা হয় 'সুড়ৌ' বা মহাপ্রসাদ। এটি হয়ে গেলে প্রত্যেককে বিতরণ করা হয়। পবিত্র হাঁড়িয়া নিয়ে সেটিও মাটিতে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। বিকেলবেলায় গ্রামের সব গরুকে সেই ময়দানে নিয়ে আসা হয় যাতে তারা দেবতাদের আশীর্বাদ লাভ করে। অবশেষে সেখানে মাদল বাজিয়ে উৎসবে মেতে ওঠেন গ্রামবাসী। এর পরের দিন হল 'হাপড়াম'। স্বর্গীয় গুরুজনদের স্মরণে এই দিনটি পালন করা হয়। তৃতীয় দিন 'খুন্টৌ। এদিন গৃহপালিত পশুদের উদ্দেশে গান করা হয় বাদ্যযন্ত্র সহযোগে। মূলত গৃহপালিত পশুদের বন্দনা করা হয় এইসব গানের মধ্য দিয়ে। সকাল থেকেই চলে গরুকে স্নান করিয়ে নানা রঙে রাঙানোর কাজ। শিঙে সিঁদুর, হলুদ দেওয়া হয়। ভালোমন্দ খাওয়ানো হয়। চতুর্থ দিন হল 'জালি'। এদিন প্রত্যেকে মিলিত হয়ে প্রত্যেকের বাড়ি যান ও খাওয়া-দাওয়া করেন। সহরায়ের শেষ দিন হল 'সাঁকরাত'। এদিন বীর বোঙ্গা অর্থাৎ বনদেবতার উদ্দেশ্যে পুজো দেওয়া হয়। পৌষ মাসের শেষ দিনেও সাঁকরাত অনুষ্ঠান পালন করেন

সাঁওতালরা। সেদিন আবার ভেজাবিঁধাও হয়। পুজোর সঙ্গে নাচ গান সহরায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোথাও কোথাও গরু ও মোষের গায়ে রঙের ছোপ দেওয়ার পর তাদের বিয়ে দেওয়া হয়। কাড়া (মোষের আঞ্চলিক নাম) খুঁটাও হয় কোনো কোনো স্থানে। মাঠের মাঝখানে বা পাড়ার ফাঁকা জায়গায় কাড়া বা মোষকে একটি শক্ত খুঁটিতে বেঁধে শুকনো চামড়া শুঁকানো হয় বা লাল শালু দেখানো হয়। এতে সেই কাড়া বা বলদ উত্তেজিত হয়ে দড়ি ছিঁড়ে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করে। অহিরার গানও গাওয়া হয় ধামসা মাদল সহযোগে। এই উৎসব উপলক্ষে ঘরে ঘরে দেওয়াল চিত্র আঁকা চলে। শুশুনিয়া এলাকায় সেভাবে রঙ বেরঙের দেওয়াল চিত্র দেখা না গেলেও নিকানো দেওয়ালে গাঢ় ধূসর রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়। পোড়া খড়ের গুঁড়ো, ছাই, গোবর ও কেঁচো মাটি দিয়ে এবং সেইসঙ্গে বাখর ফলের বীজ দিয়ে টেনে টেনে দেওয়ালগুলিকে সুন্দর ও মসৃণ করা হয়।

বাহা উৎসব : বাহা অর্থাৎ ফুলের উৎসব। বাহা শব্দের অন্য অর্থ হল কুমারী মেয়ে। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব হয়। ফাল্গুনের চাঁদ 'বাহা চাঁদ'কে দেখার পর পাঁচ দিনের দিন শুরু হয় বাহা উৎসব। এই উৎসবের প্রথম দিনকে বলে 'উম', দ্বিতীয় দিনকে বলা হয় 'সার্দি' এবং তৃতীয় তথা শেষ দিনকে বলা হয় 'সেঁন্দরা'। কিংবদন্তী আছে যে, সাঁওতালরা অত্যাচারী মাধো সিং কর্তৃক বিতাড়িত হলে তারা আশ্রয় খোঁজেন। তাঁদের দলপতি আশ্রয় খোঁজার জন্য আকাশের দিকে তীর ছোঁড়েন। তীরটি একটি শাল গাছের নীচে ভূপতিত হয়। তখন তারা সেখানেই আশ্রয় নেয়। এই শালগাছ তাই সাঁওতালদের অত্যন্ত পবিত্র বৃক্ষ। একে বলা হয় 'সারি সারজম' অর্থাৎ 'সত্য শাল'। যেদিন তারা এই আশ্রয় পায় সেদিন ছিল ফাল্গুনী পূর্ণিমা। এই দিনেই সাঁওতালদের স্থায়ী আশ্রয় ও ধর্ম নির্দিষ্ট হয়েছিল। তাই ঐদিনটি তাঁদের কাছে অতি আনন্দের। সাঁওতাল মেয়েরা এই পরব না করলে সারজাম বাহা বা শাল ফুল, ইচাক বাহা, মুরুপ বাহা ইত্যাদি ফুল খোঁপায় গুঁজতে পারে না। এই পরব আসলে প্রকৃতিকে নতুন করে নতুনভাবে স্পর্শ করার পরব। অ-আদিবাসীদের অনেক ক্ষেত্রে বসন্ত উৎসব বর্তমানে পালন করা হয়ে থাকে। বাহা পরব আসলে সাঁওতালদের বসন্ত পরব যা অতি প্রাচীন। অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে বাড়ির মহিলারা স্নান করে ঘর-দুয়ার পরিস্কার করেন। দ্বিতীয় দিনে জাহের থানে মারাং বুরু, জাহের এরা ও পারগানা বোঙ্গার পুজো হয়। পুজো করেন নাইকে। দেবতাকে উৎসর্গ করা হয় শাল ও মহুল ফুল। এই সঙ্গে নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে নাচ করেন। পুরুষেরা আলাদা সারিতে দাঁড়িয়ে শরীর দুলিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নাচ করেন। এই ধরনের লাফানো নাচকে বলা হয় বাহা দন ও জাতুর দন। পূজা হয়ে গেলে নাইকে মাথায় শাল ফুলের ডালা ধরে গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে যান। পেছনে একজন যুবক জলপূর্ণ কলসী নিয়ে যায়। প্রত্যেক বাড়ির মহিলারা ঐ নাইকে ও যুবকের পা ধুইয়ে দেন। নাইকে তার ডালা থেকে পুজোর পবিত্র ফুল দেন। এই কাজ সমাপনের পর নাইকের বাড়ির উঠানে গ্রামবাসী এসে জড়ো হন ও নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়ার মাধ্যমে রাত কাটান। এ দিন যুবক-যুবতীদের কাছে অনেকটা ভ্যালেন্টাইন ডে-র মতো। পরের দিন সেন্দরা। সেদিন গ্রামের পুরুষেরা শিকারে যায়। প্রত্যেকেই এদিন হাঁড়িয়া পান করেন। বাড়িতে রঙিন জল তৈরি করা

থাকে। ঐ জল ছিটিয়ে তারা আনন্দে মেতে ওঠে। একে বলে 'বাহা বাস্কে'। এই অনুষ্ঠানটি অনেকটা দোল উৎসবের মতো।

সাকরাত : পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে এই উৎসব হয়। এটি সাঁওতালদের কাছে অতি পবিত্র দিন, মুক্তির দিন। এটি আবার বছরের শেষ দিন। এই সময়ে ফসল তোলাও শেষ। একটি বছর থেকে আর একটি বছরে পদার্পণের ক্ষণটিতে সাঁওতালরা তাঁদের পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা ও নমস্কার জানায়। অনুষ্ঠান শুরু হয় রাত্রে, চলে সারা রাত। তবে সেদিন সকাল থেকেই পুজার আয়োজন চলে। সকালেই প্রতি বাড়িতে মুরগি কেটে রান্না করা হয়, তৈরি করা হয় পিঠে। সেসব খাদ্য দ্রব্য প্রথমে মারাং বুরু ও পূর্বপুরুষদের নিবেদন করা হয়, তারপর তারা নিজেরা গ্রহণ করে। উৎসবের দিন বিকেলে নাইকে বা জগমাঝি একটি কলাগাছের কাণ্ডকে গ্রামের বাইরে ফাঁকা মাঠে পুঁতে রাখেন। একে 'বেঝা' বা 'ভ্যাজা' বলে। এটি আসলে অশুভ শক্তির প্রতীক। সবার প্রথমে নাইকে এই অশুভ শক্তির দিকে তীর ছোঁড়েন। তারপর বাকি গ্রামবাসীরা তীর ছোঁড়েন। আসলে এই অশুভ শক্তিকে বিনাশ করতেই এই তীর ছোঁড়া। যিনি কলা গাছের কাণ্ডকে তীর দিয়ে বিদ্ধ করতে পারেন, তাকে নিয়ে আনন্দ করতে করতে সবাই বাড়ি ফেরে। রাত্রে 'লাঁগড়ে' নাচের আয়োজন করা হয়।

আখ্যান যাত্রা বা আখ্যান পরব : মাঘ মাসের প্রথম দিন আদিবাসী সমাজে নববর্ষের সূচনা করে। তাই নতুন বছরের দিনগুলি যাতে ভালো কাটে, শরীর সুস্থ থাকে, গ্রামবাসী সুস্থ থাকে, সেই কামনায় জাহের থানে পূজা নিবেদন করা হয়। এদিন তারা শিকার থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন ওষধি গাছের লতা-পাতা-শেকড় দিয়ে প্রস্তুত করা ওষুধ সেবন করেন।

মাঘসীম : এটিও মাঘ মাসের পুজো। জাহের থানে পুজো হয়ে যাওয়ার পর যুবকেরা প্রবীণ ব্যক্তিদের নির্দেশে ডালপালা ও গুল্ম সংগ্রহ করে। এগুলি দিয়ে তারা ছোট ছোট গাড়ী তৈরি করে যাকে বলা হয় 'সগড়গাড়ি' বা বোঝাই গাড়ি। অবশেষে সেইসব ডালপালা ও গুল্ম মাঝির ঘরের চালায় তুলে রাখে এবং জল ও ছোট ছোট নুড়িপাথর ছোঁড়ে। এগুলি আসলে শিলাবৃষ্টির প্রতীক। সাঁওতালদের প্রতিনিয়ত জঙ্গলে প্রবেশ করতে হয়। তাই জঙ্গলে ঢুকতে যাতে কোনোরূপ বিপদের সম্মুখীন হতে না হয়, সেইজন্যই এই পূজানুষ্ঠান।

দেবদেবী : শুশুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসী গ্রামগুলির প্রান্তদেশে ফাঁকা স্থানে তিনটি পাথরের লম্বা ফালিকে পুঁতে রেখে পুজো করা হয়। এগুলি আসলে সাঁওতালি দেব-দেবী। এই দেবদেবীর থানগুলিকে জাহের থান বলে। শিউলিবনা, রামনাথপুর, গিধুরিয়ায় এরকম জাহের থান আছে। সাঁওতালদের প্রধান দেবদেবীরা হলেন জাহের বুড়ী বা ঠাকুরান, জাহের হাড়াম বা গরাম ঠাকুর, মারাংবুরু, মড়েক, তুরুইক ও সীমাসাড়ে। মারাংবুরু হল সাঁওতালদের প্রধান দেবতা। মড়েক হলেন ৫ জন দেবতা। জাহের থানে ৫ টি পাথর প্রোথিত অবস্থায় থাকে, সেটিই মড়েক। এর প্রতীক তীর ধনুক। তুরুইক হল ছয় জন দেবী, যারা একাসনে পূজিতা হন। সীমাসাড়ে হলেন পশু ও বন রক্ষাকারী দেবতা।

জাহের থানগুলি প্রধানত শাল, মহুল বা তেঁতুল গাছের তলায় হয়। শিউলিবনার কাছে জাহের থানে যে তিন দেবতার প্রতীক রূপে পাথর প্রোথিত তারা হলেন জাহের বুড়ী, জাহের হাড়াম ও মারাংবুরু। এর বার্ষিক পুজো হয় মাঘ মাসে। আছে সিং বোঙ্গার উপাসনা। এছাড়াও আদিবাসী গ্রামগুলিতে শাল গাছের গুঁড়ি পুঁতে রাখা হয় আটচালার ঠিক মাঝখানে। এলাকার আদিবাসীরা প্রতি উৎসব অনুষ্ঠানে মারাংবুরু বা লিটাগোঁসাইয়ের উদ্দেশ্যে পুজো দেন। জাহের থানে মুরগী বলিও হয়। বর্তমানে এই এলাকার আদিবাসীদের দেব দেবীদের সঙ্গে মনসা ইত্যাদি হিন্দু দেবদেবীও সংযুক্ত হয়েছেন। জাতক জাতিকার নামেও দেখা যায়, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, মনসা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা নাম রাখা হচ্ছে। দেবতাদের পাশাপাশি চুড়িন, যুগিন ইত্যাদি অপদেবতাদেরও পূজা করে সাঁওতালরা।

মাসিক পুজো : গ্রামের মানুষদের মিলিত পুজো প্রতি মাসেই হয়ে থাকে। সাঁওতালরা এই পুজোগুলি সুষ্ঠুভাবে করে থাকেন নিজেদের সুখ-শান্তির জন্য। মাঘ মাস থেকে তাদের নববর্ষ। মাঘ মাসে তাই পুজা হোয় 'মাঘ সিমবঙ্গা' দিয়ে। ফাল্গুনে 'বাহাবঙ্গা' , চৈত্রে 'পাতাবঙ্গা', বৈশাখে 'সেন্দরাবঙ্গা', জ্যৈষ্ঠে 'এরঃ সিমবঙ্গা' , আষাঢ়ে 'আষাঢ়িয়া বঙ্গা', শ্রাবণে 'নাওয়ই বঙ্গা', ভাদ্রে হইবয়ইর সিমবঙ্গা', আশ্বিনে 'দাঁশায় বঙ্গা', কার্তিকে 'সহরায় বঙ্গা', অগ্রহায়ণে 'জান্থাড় সিমবঙ্গা', পৌষে 'পুষ বঙ্গা সাক্রাত' পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সাঁওতালরা মনে করেন এই দেবতারাই মাস, দিন, বার সৃষ্টি করেছেন। তাই তাঁদের নামে মাস বা বার। যেমন মাসের ক্ষেত্রে মাঘ, ফাগুন, চইত, বৈশৈত, ঝেট, আষাঢ়, শান্, ভাদর, দাঁশায়, সহরায়, আঁঘাড়, পুষবঙ্গা ; বারের ক্ষেত্রে রবিবার থেকে সিঙ্গে, অতে, বালে, সাগুন, সারদি, জারুম ঞুহুম। বছরের প্রতি মাসে এইভাবে পূজা অনুষ্ঠানের সঙ্গে সাঁওতাল জনজীবন জড়িত।

কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠান : যে সব জনজাতি কৃষিকর্মের সঙ্গে যুক্ত তারা প্রত্যেকেই কৃষি সংক্রান্ত কোন না কোন উৎসব বা কতিপয় উৎসব করে থাকেন। মূলত বীজের সঠিক পরিচর্যা, চারা রোপন, চারার সঠিক বৃদ্ধি, উপযুক্ত বৃষ্টিপাত, সঠিক ফলনের কামনায় এইসব উৎসবগুলি হয়ে থাকে। সাধারণত বাড়ির মেয়েরা এই উৎসবে সরাসরি যুক্ত থাকেন। সাঁওতাল জনজাতির ক্ষেত্রে জাহের থানে পূজা দেওয়া হয়। এইরূপ কৃষি সংক্রান্ত কয়েকটি উৎসব যা সাঁওতালরা পালন করে থাকেন সেগুলি দেখা যেতে পারে—

ক) মামড়েঃ : এই পরব হয় বৈশাখ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে। কৃষিকাজ যাতে ভালো হয়, বৃষ্টি ভালো হয়, সেইজন্য জাহের থানে পূজা দেওয়া হয়। খ) এরঃসীম : বীজ বপন করার সময় সাঁওতালদের বিশেষ অনুষ্ঠান হল এরঃসীম। উপযুক্ত বৃষ্টিপাত, শস্যবীজের সঠিক অঙ্কুরোদ্গম ও সতেজ চারার কামনায় জাহের থানে গ্রামদেবতার আরাধনায় রত হন গ্রামবাসীরা। গ) আষাঢ়িয়া : চষা জমিতে ধানের চারা রোপন করার সময় এই উৎসব পালন করা হয়। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ঘ) হারিয়াড় : শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে এই উৎসব হয়। চারা রোপন করার পর যাতে গাছের কোনো ক্ষতি না হয়, উপযুক্ত বৃষ্টি যেন হয়, যাতে পোকা না লাগে, গাছের সুস্বাস্থ্য কামনা করে গ্রামবাসীরা এই পূজা করেন। ঙ) জানথাড়ঃ : অগ্রহায়ণ মাসে এই অনুষ্ঠান হয়। সেসময়

ফসল প্রায় পেকে গেছে। এইসময়েই পাকা ফসলে পোকা ধরে ফসল নষ্ট করে দেয়। তাই যাতে পোকায় ফসল নষ্ট করতে না পারে সেইজন্য সাঁওতাল গ্রামবাসীরা সম্মিলিতভাবে জাহের থানে গিয়ে দেবতার পূজা দেন। পূজার আগে তারা একটি ভেড়া কিনে আনেন। পূজার দিন নাইকে সকলের বাড়ি থেকে খিচুড়ি রান্নার জন্য চাল ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করে আনেন। জাহের থানে দেবতার উদ্দেশ্যে ভেড়াটি উৎসর্গ করা হয়। খিচুড়িও উৎসর্গ করা হয়। তারপর সকল গ্রামবাসী খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। মেয়েরা এই প্রসাদ খায় না। এই অনুষ্ঠানের পর থেকেই ফসল কাটা শুরু হয়ে যায়। চ) লাঁগড়ে : পণ্ডিতেরা মনে করেন 'লাঁগড়ে' শব্দের অর্থ হল মাটির উপরের ঘাস চেঁছে পরিষ্কার করা। আবার 'লাঁগড়ে'-র আক্ষরিক অর্থ হল ক্লান্তি ভুলে যাওয়া। গ্রামের যে স্থানটি আখড়া বা মিলন স্থল, সেই জায়গাটি পরিষ্কার করে গোবর জল দিয়ে শৌচ করা হয়। তারপর গ্রামবাসীরা সবাই জড়ো হয়ে স্তব ও প্রার্থনা করেন এবং উৎসবে মেতে ওঠেন। তারা মনে করেন, এই উৎসবের কারণেই কৃষিকাজের জন্য উপযুক্ত বৃষ্টিপাত সম্ভব। অ-আদিবাসীদের মেঘারানির ব্রতের মতো বৃষ্টি কামনায় সাঁওতালদের এই উৎসব হয়।

উৎসব-পার্বণের অঙ্গ— নাচ-গান : মাণিকলাল সিংহ জানিয়েছেন, জগতের আদিম গোষ্ঠীগুলি উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য নৃত্য করত। সে যুগে ফসল উৎসবের সঙ্গে নৃত্যের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল। সাঁওতাল জনজাতির ক্ষেত্রেও দেখা যায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উৎসব উপলক্ষে নাচ-গানের প্রতুলতা। কৃষিকাজ যাতে ভালো হয়, গ্রামের যাতে মঙ্গল হয় অথবা দেবতা কিংবা অপদেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিংবা আপনভোলা মনে সাঁওতালরা সম্মিলিতভাবে নাচ ও গানে মেতে ওঠে। সাঁওতাল জাতির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার নাচ প্রচলিত। সব নাচই কিন্তু সব অনুষ্ঠানে করা হয় না। তাই বিয়ের সময় যে নাচ করা হয়, অন্য উৎসবের সময় সেই নাচ করা হয় না। ফলে বোঝা যায় অনুষ্ঠান অনুযায়ী নাচের বিভিন্নতা ও গুরুত্ব আছে। পুরুষ ও নারী সবসময় একই সঙ্গে নাচ করেন না। আলাদা আলাদা ভাবেও হয়। আবার বিবাহিত মেয়েদের নাচে পুরুষেরা বা কুমারী মেয়েরা যোগ দেয় না। আবার উল্টোটাও হয়। মাণিকবাবু সাঁওতালদের নাচগুলিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—

ক) কেবল মেয়েদের নাচ—পাক, ডম, ডাহা ইত্যাদি। মূলত বিয়েকে কেন্দ্র করে এই নাচগুলি পরিবেশন করা হয়।

খ) মেয়ে-পুরুষের সম্মিলিত নাচ—লাঁগড়ে, দং, গুলাউড়ি, বাহা, রিঞ্জা ইত্যাদি ঋতু উৎসব ও গোষ্ঠীর কল্যাণার্থে এই নাচ অনুষ্ঠিত হয়।

গ) কেবল পুরুষদের নাচ—লবয়, দুঙ্গেড় ইত্যাদি।

শুধু নাচ নয়, নাচের সঙ্গে গানগুলিও এই অনুষ্ঠানে ওতপ্রোত জড়িত।

বন্ধু পাতানো—কর্‌মু ধর্‌মু ও ফুল : সাঁওতাল সমাজে অবিবাহিত দুই কিশোরের মধ্যে কিংবা দুই কিশোরীর মধ্যে বন্ধুত্ব পাতানোর চল আছে। ছেলেদের ক্ষেত্রে একজনকে বলা হয় 'কর্‌মু', আর একজনকে বলা হয় 'ধর্‌মু'। তারা সারা জীবন একে অপরের বন্ধু হয়ে থাকে। অন্যদিকে দুই অবিবাহিত মেয়ের ক্ষেত্রে এই বন্ধুত্ব পাতানোকে বলা হয় 'ফুল'

পাতানো। দুই কিশোরী একই ফুল গাছের কাছে গিয়ে ফুল তুলে নিজ নিজ খোঁপায় গুঁজে। তারপর প্রত্যেকে নিজের খোঁপা থেকে একটি ফুল বের করে অন্যের খোঁপায় গুঁজে দেয়। এভাবেই তারা একে অপরের বন্ধু হয় এবং একে অপরকে 'ফুল' বলে সম্বোধন করে। এই বন্ধুত্ব কেবল নামেই নয়, বরং দুই পরিবারের মধ্যেও আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সুখে-দুঃখে সঙ্গে থাকার বিষয়টি খুব সহজেই দুই বন্ধু সহ তাঁদের পরিবারের মধ্যে বিস্তারলাভ করে।

দেওয়ালচিত্র : সাঁওতালদের গ্রামগুলি যেমন ছোট ছোট, ঘরগুলিও তেমনি ছোট ছোট। আসলে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই তাঁদের সম্বল। কিন্তু এত পরিচ্ছন্ন যে অন্য প্রাসাদকেও হার মানায়। মাটির বাড়িগুলিতে উপযুক্ত দাওয়া থাকে। তাতে সময়ে সময়ে বসা যায়। বাড়ির দাওয়া, উঠোন, ঘরের মেঝে ও দেওয়ালগুলি এত সুন্দর ও এত মসৃণ যেন সান-বাঁধানো। এর পেছনে থাকে তাঁদের ইচ্ছা, শ্রম, সৌন্দর্যপিয়াসু মনোভাব ও পরিচ্ছন্নতা নামক গুণ। পোড়াখড়ের গুড়ো, ছাই, গোবর, কেঁচো মাটি ইত্যাদি মিশিয়ে মেঝে ও দেওয়ালগুলিকে সুন্দর করা হয়। মূলত বর্ষার পর কালী পূজার সময় দেওয়ালে বিভিন্ন নকশা ও ছবি আঁকা হয়। অঞ্চলভেদে এই সব দেওয়ালচিত্রের বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। পুরুলিয়া ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে সাঁওতাল আদিবাসীদের দেওয়ালচিত্র বিভিন্নরকমের দেখা যায়। তুলনায় বাঁকুড়ায় অনেক কম। তবে ঘরগুলিকে সুন্দর করে নিকানো হয় ও মসৃণ করা হয়। কোথাও কোথাও নকশা করে ছোট ছোট বরফি আকৃতির কাঁচ বসানো হয়। তবে বাঁকুড়ার আদিবাসী গ্রামগুলিতে বরফি আকৃতির বা ত্রিকোণ আকৃতির জ্যামিতিক নকশা লক্ষ করা যায়। পূর্বে খড়ি, গিরি মাটি, হলুদ ইত্যাদি ব্যবহার করা হলেও বর্তমানে অনেকে কেনা রঙ ব্যবহার করেন। দরজার ওপরে ও দুই পাশে বিজোড় সংখ্যক ফোঁটা বা হাতের ছাপ দেওয়া হয় কোথাও কোথাও। কথিত, এতে গৃহের মঙ্গল হয়, কোনরূপ অপদেবতা ঐ গৃহে প্রবেশ করতে পারে না।

গ্রন্থপঞ্জি

১। The Tribes & Castes of Bengal, H.H. Risley

২। Report on the Condition of the Sonthals in the Districts of Birbhum, Bankura, Midnapore and North Balasore, M.C. Mcalpin.

৩। A Statistical Account of Bengal, by W. W. Hunter, Vol- 4, Trubner & co., London, 1876, E-Book

৪। Census Report 2011

৫। বাঁকুড়া, তরুণদেব ভট্টাচার্য

৬। ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ড. অতুল সুর

৭। রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (১ম খণ্ড), মাণিকলাল সিংহ

৮। খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি, অনুবাদ ও সম্পাদনা সুকুমার সিকদার ও সারদা প্রসাদ কিস্কু

নির্বোধ

প্রশান্ত কুমার ঝরিয়াৎ

মহিমবাবুর গ্রামে বাড়ি, বেশ অবস্থাপন্ন চাষী। কয়েকটি পুকুর, তাতে মাছ চাষ করে ভালোই আয় করেন। এছাড়াও রয়েছে কয়েক একর জমি যাতে ধান চাষ করেন। এছাড়াও অন্যান্য ফসল তো রয়েছেই। ব্যাঙ্কে তাঁর মোটা টাকার ব্যালেন্স। বাড়িতে চারজন চাকর রয়েছে ফাই-ফরমাশ খাটার জন্য। পড়াশুনায় স্কুলের গণ্ডি না পেরোতে পারলেও হিসাবে তিনি অত্যন্ত দক্ষ। এক পয়সা এদিক-ওদিক হারাবার যো নেই। এইতো সেদিন ভোলাকে পঞ্চাশ টাকা দিলেন মিষ্টি কিনতে। পাঁচ দিন পর মহিমবাবুর খেয়াল হলো মিষ্টি কিনতে তো পঁয়তাল্লিশ টাকা খরচ হয়েছে, তখনই ডাক পড়লো ভোলার। তলব পাওয়া মাত্র ভোলা এসে হাজির। ভোলা, আগের দিনের পাঁচ টাকাটা কই? কাঁচুমাচু মুখে ভোলার উত্তর, আজ্ঞে, খরচ করে ফেলেছি।

--তা বেশ, ভালো করেছো, কিন্তু এ মাসে তোমার মাইনে থেকে ছয় টাকা কাটা যাবে, মহিম বাবুর হুংকার।

--কিন্তু বাবু, কম্পিত কণ্ঠে ভোলা উত্তর দেয়, আগের মাসে আপনাকে বাজার করে এসে দশ টাকা ফেরত দিতে গেলে আপনি ওটা আমাকে রেখে দিতে বললেন। তাই এবারে আর পাঁচ টাকাটা ফেরত দিইনি।

--চুপ বেয়াদব, আবার হুংকার ছাড়লেন মহিম বাবু, ওই টাকাটা আমি তোমাকে দিয়েছিলাম। কিন্তু এবারের টাকাটা তুমি নিজে থেকে কেটে নিয়েছ, দুটোর মধ্যে অনেক তফাৎ আছে।

এই ভোলা ছাড়া আবার মহিম বাবু চলে না। শৈশবে মা বাবা মারা যাওয়ার পর মহিম বাবুর কাছে এসে মানুষ। কখন কোনটা দরকার সেটা ভোলার চেয়ে ভালো কেউ জানে না, এমনকি মহিম গিন্নিও না। ইতিমধ্যেই ভোলা তামাক সেজে নিয়ে হাজির। বাবুর হাতে দিতেই বাবুর মন একেবারে খুশ। ইজি চেয়ারে বসে একমনে তামাক টানছেন প্রতিবার তার সাথে সাথে ভুড়িটা ওঠানামা করছে।

মহিমবাবুর একটু তন্দ্রা মতো এসেছিল। হঠাৎ এই সময় মহিমগিন্নির চিৎকার—বলি, এইরকম মরার মতন সবসময় ঘুমালে হবে, এদিকে মেয়েটা যে বড় হলো, তার একটা বিয়ে দিতে হবে না? মহিম বাবুর তন্দ্রাভাব গেল চটকে। পৃথিবীতে তিনি যদি কাউকে ভয় করেন, তবে তার এই বউকে। উকিলের বাড়ির মেয়ে। কিছুতেই ঝগড়াতে পরাস্ত করতে পারেন না। ঝগড়ার মাঝে এমন সব পয়েন্ট তুলে ধরেন যে মহিমবাবুর মতন এমন

ঘোড়েল লোকও হতভম্ব হয়ে যান। তবে দজ্জাল হলেও মহিম বাবুর খেয়াল সে খুব রাখে। কখন তার প্রেসারের ওষুধ খেতে হবে, কখন হজমের গুলিটা দিতে হবে, এগুলো তার স্ত্রীর একেবারে নখদর্পনে। এই তো সেবারের ভাদ্র মাসে তার স্ত্রী বাপের বাড়িতে চলে যাওয়ায় মহিম বাবুর প্রেসারের ওষুধ ঠিকমতন খাওয়া হয়নি। প্রেসার মাথায় চড়ে গিয়ে যায় যায় অবস্থা। গিন্নিমা একমাস থাকবে বলে পণ করে গিয়েও সাত দিনের মধ্যে ফিরে আসতে বাধ্য হন। তারপর থেকে আর বাপের বাড়ী যাবার নাম করেনি।

মহিম বাবু মেয়ের আরতি। প্রায় আঠারো বছর বয়স হয়ে গেল। গ্রামের স্কুল থেকেই উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে শহরের কলেজে পড়তে যাবে কি যাবে না, এই নিয়ে টালবাহানা চলছে। মহিম বাবু ইচ্ছে পড়ুক, কিন্তু গিন্নিমার ইচ্ছা আগে বিয়ে হয়ে যাক, তারপর পড়ুক।

আরতি খুব লাজুক স্বভাবের মেয়ে। বাড়িতে কেউ অচেনা অতিথি এলে সে ছুটে একেবারে বাড়ির ভিতরে। বাবার সে নয়নের মণি। এমন মেয়েকে বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে হবে চিন্তা করলেই মহিমবাবুর বুকখানা মোচড় দিয়ে ওঠে। কিন্তু কন্যাদায় বড় দায়। তাকে সুপাত্রস্থ করা পিতার একান্ত কর্তব্য। এই একটি মেয়ে তার, আর কোনো ছেলেপুলে হয়নি। তাই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে তিনি কি নিয়ে থাকবেন, এটা ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যায়। সমস্ত মানসিক দ্বন্দ্ব কাটিয়ে মহিমবাবু মন স্থির করলেন একটা ভালো পাত্রের খোঁজ করতেই হবে। তার টাকা পয়সার অভাব নেই, অভাব নেই গুনগ্রাহী লোকেরও। তারাই মহিমবাবুকে সন্ধান দিলেন কয়েকজন ভালো পাত্রের। সেই রকম একজন ভাল পাত্র তরুণ ডাক্তারকে দেখতে ভোলাকে নিয়ে মহিমবাবু শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

ঠিকানা মিলিয়ে ডাক্তারের চেম্বারে হাজির মহিমবাবু। ডাক্তারবাবুর চেম্বারে লম্বা লাইন। রোগীকে মুখ তুলে দেখছেন, নাড়ি টিপছেন, আর ঘাড় গুঁজে ওষুধ লিখছেন। ওষুধ লেখা হয়ে গেলে ভিজিট সাইড ব্যাগে গুঁজে রাখছেন। ব্যাগটাও ক্রমশ ফুলে উঠছে। মহিমবাবুর উদ্দেশ্য জানতে পেরে ডাক্তারবাবু তাকে বাড়ির ভিতরে গিয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলতে বললেন। কিন্তু মহিম বাবু অনেক পোড়খাওয়া লোক। আগে পাত্রকে ভালো করে যাচাই করবেন, তারপর তাঁর বাবার সঙ্গে কথা। চেম্বারের বাইরে বেরিয়ে মহিমবাবু ডাক্তারের উপর নজর রেখে চলেছেন। ডাক্তারবাবু রোগী দেখে চলেছেন। মাঝেমাঝেই টেবিলের উপর রাখা বড় সেলফোনটা বেজে চলেছে, কানে দিয়ে কাউকে কিছু উপদেশ দিচ্ছেন, আবার রেখে দিচ্ছেন। প্রতি পাঁচ মিনিট ছাড়াই সেল ফোন বেজে চলেছে। তার মাঝে চলছে রোগী দেখা। এ যেন ব্যস্ততার চরমসীমা। ডাক্তারবাবু চেহারাটা এবার মহিমবাবু লক্ষ করলেন। চেহারা বেশ ছিপছিপে, সুদর্শন, শ্যাম্পু করা চুল, পুরো কার্তিকের মতন। কিন্তু মুখে হাসি নেই। যন্ত্রের মতো কাজ করে চলেছেন। চোখের তলায় একটু কালি। মনে হয় রাতে ঠিকমতো ঘুম হয় না।

প্রায় তিন চার ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর চেম্বার ফাঁকা হতে ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়ালেন। মহিমবাবু ভাবলেন, যাক, এবার নিশ্চয়ই সে তার বাড়ি ঢুকবে আর মহিমবাবু এই ফাঁকে তাঁর বাবার সঙ্গে কথা বলে নেবেন। কিন্তু একি! চেম্বার থেকে ঘরে না ঢুকে বাইরে দাঁড় করানো গাড়িতে তিনি উঠে পড়লেন। গাড়িও ছেড়ে দিল। মহিমবাবুও কম যান না। তিনিও তাঁর গাড়ী করে পিছু নিলেন। পিছু নিতে নিতে এসে পৌঁছালেন একটা ঝা-চকচকে নার্সিংহোমে। দেখলেন ডাক্তারবাবু ঢুকে গেলেন ভেতরে।

মহিমবাবু আজ যেন গোয়েন্দা হয়ে গেছেন। তিনিও বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন ডাক্তার বাবুর জন্য। ঘন্টাখানেক পরে ডাক্তারবাবু বেরোলেন। আবার গাড়িতে উঠলেন। যথারীতি মহিমবাবুও পিছু নিলেন। আবার এক সুবৃহৎ নার্সিংহোম ডাক্তারবাবু ঢুকলেন। আবার ঘন্টাখানেক পরে বের হলেন। এইভাবে বেশ কয়েকটি নার্সিংহোম ঘুরে ডাক্তারবাবু যখন বাড়ি ফিরলেন, ঘড়িতে তখন রাত আটটা। বাড়িতে এসে মহিমবাবু ভাবলেন, এবার পাত্র এবং পাত্রের বাবার সঙ্গে একসাথে বসে কথা বলা যাবে। কিন্তু কপাল মন্দ। ডাক্তারবাবু বাড়ি না গিয়ে আবার চেম্বারে ঢুকলেন। রোগীরা অপেক্ষা করছে। মহিমবাবুও অপেক্ষা করতে করতে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ভাঙ্গতেই দেখলেন রাত্রি এগারোটা বাজে। তখনও জনা দশেক রোগী অপেক্ষা করছেন।

মহিমবাবু ডাকলেন, ভোলা। ভোলা বাবুর মুখের দিকে তাকালো।

---ভোলা, বাড়ি চল। এই পাত্রের সাথে তোর দিদিমনির বিয়ে দিলে ও তো বরের মুখই দেখতে পাবেনা। শুধু সোনাদানা আর দামি সেলফোন নিয়ে সংসার করতে হবে। স্বামীকে পাবে না। এ পাত্র ক্যানসেল। চল চল, বাড়ি চল, অনেক রাত হয়ে গেছে।

ডাক্তার পাত্র দেখে আসার পর থেকে মহিমবাবু গুম হয়ে রইলেন কিছুদিন। এর মধ্যেই মাধব ঘটক বেশ কিছু ভালো ভালো পাত্রের খোঁজ দিয়েছেন। কিন্তু মহিমবাবুর আর যেন পাত্র দেখতে যেতে উৎসাহ নেই। রবিবার মহিমবাবু সকালের খবরের কাগজ খুলে সবে চায়ে চুমুক দিয়েছেন, এমন সময় মাধব ঘটক এসে হাজির।

---কি হে, মাধব, আজ আবার কি খবর এনেছো? যত্তসব গাঁজাখুরি গল্প তোমার। একটাও সঠিক পাত্রের সন্ধান দিতে পারছ না।

মাধব হাত কচলে উত্তর দিল, আজ্ঞে বাবু, এবার একটা ভালো উকিল পাত্র পেয়েছি। বিশাল পসার। যখন কোর্টে সওয়াল করতে ওঠেন, তখন নাকি জজ সাহেবরাও তটস্থ হয়ে থাকেন এই বুঝি আইনের প্যাঁচে তারা কুপোকাত হয়ে যান। চলুন বাবু যাবেন তো এইবেলা দেখে আসি। বেশি দূরে নয়, গাড়িতে ঘন্টাখানেক লাগবে। আছিপুরের পরেই মুকুন্দপুর।

মুকুন্দপুর বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। উকিলের নাম বলতেই গাঁয়ের লোকেরা দেখিয়ে দিলেন। বিশাল তিনতলা বাড়ি, বড় ফটক। সামনে বাগানের মতন করা রয়েছে। বাগানের মাঝখান থেকে পাথর বসানো রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে বৈঠকখানার ঘরের দিকে, সেখানেই উকিলবাবুর চেম্বার। মক্কেলরা বৈঠকখানার ঘরের ভিতরে বসে রয়েছেন। ভেতরের দরজা ঠেলে মাধব ঘটক মহিমবাবুকে নিয়ে প্রবেশ করলেন। রমেন উকিল ইশারায় তাদের বসতে বললেন। মক্কেলের সঙ্গে উকিল সাহেবের আলোচনা চলছে। মক্কেল ফৌজদারি মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন। পড়শির সঙ্গে মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে পুলিশের নজর এড়িয়ে মক্কেল পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। উকিলের কাছে এসেছেন পরামর্শ নিতে।

--- আপনার সঙ্গে ঝামেলা কবে হয়েছিল?, উকিলের প্রশ্ন মক্কেলকে।

---আজ্ঞে, গত রবিবার। মক্কেলের উত্তর।

---রবিবার আপনি দিঘাতে ছিলেন, রমেন উকিল মক্কেলকে বললেন।

---কিন্তু আমি তো বাড়িতেই ছিলাম, মক্কেল অবাক হয়ে উত্তর দেন।

---আমি বলছি তো আপনি দিঘাতে ছিলেন। ওখানে আমার পরিচিত হোটেল আছে। আমি বলে দিচ্ছি সে আপনাকে সব বিল বানিয়ে দেবে। সেই বিলগুলি কোর্টে আমি পেশ করে বলবো আমার মক্কেলকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।
---কিন্তু এখানকার লোকেরা যদি সাক্ষী দেয় আমি বাড়িতেই ছিলাম, তখন?, মক্কেলের প্রশ্ন।
---এইরকম তিন-চারজন সাক্ষীকে পয়সা দিয়ে কিনে নেবেন। আর তাদের আমার কাছে নিয়ে আসবেন। তাদেরকে বলে দেবো জজ সাহেবের কাছে কী বলতে হবে।

মহিম বাবুর মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। কানে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে। এইরকম ভাবে এক একটি মক্কেল ঢুকছেন আর রমেন উকিল তাদের উদ্ধারের জন্য মিথ্যার মালা সাজিয়ে মক্কেলের গলায় পরিয়ে দিচ্ছেন। মহিমবাবু টলতে টলতে মাধব ঘটকের হাত ধরে উঠে পড়লেন। 'কি হল বাবু, শরীর খারাপ? ডাক্তার দেখাতে হবে?', মাধবের শশব্যস্ত প্রশ্ন। 'না-না, আমাকে বাইরে নিয়ে চলো তাড়াতাড়ি'। বাইরে এসে গাড়িতে বসে মহিমবাবু হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। 'উফ! বাবা, কোথায় এসে পড়েছিলাম। এক্কেবারে মিথ্যার বেসাতি। এ তো মেয়েকে বিয়ে করার পরের দিনই বলবে এই মেয়েকে তো আমি বিয়ে করিনি। খুব বাঁচন বেঁচে গেছি। বাড়ি চ, বাড়ি চ।

দিন যায়, মাস যায়। বছর ঘুরে গেল। মহিমবাবু মেয়ের জন্য মনের মতো পাত্র খুঁজে পান না। মাঝে দু-তিনটি পাত্রের সন্ধান ঘটক দিলেও তা মনে ধরেনি। এদিকে তার শালার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। আগামী ২১ শে ফাল্গুন শালার মেয়ে রীতার বিয়ে। ছেলে মস্ত বড় সরকারি চাকুরে। অফিসের গাড়ি তার সর্বক্ষণের সঙ্গী, সাথে দু'জন সহকারি। এহেন পাত্র কখনো হাত ছাড়া করা যায়! তাই মহিমবাবুর শালা বেণীমাধব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলেছেন। শুধু খারাপের মধ্যে একটাই, ছেলেকে বছরে ছয় মাস বাইরে থাকতে হয়। হিল্লী দিল্লী ঘুরে বেড়াতে হয়। এখানে মেয়ে তো রানি হয়ে থাকবে। বড় গাড়ি, বাড়ি, সেলফোন, অর্ধেক দেয়ালজোড়া রঙিন টিভি--- এসব নিয়েই মেয়ের সময় কেটে যাবে।

শালার মেয়ের বিয়ের দিন সকাল থেকেই মহিমবাবু ব্যস্ত। সবকিছু ঠিকঠাক নিয়ে যেতে হবে। বিয়ের সোনাটা স্যাকরার দোকান থেকে মহিমবাবুকেই নিয়ে যেতে হবে। বউ আর মেয়ে দুদিন আগেই চলে গেছে। বিশাল বিয়েবাড়ি, আলোর রোশনাই। বরপক্ষ এসেছেন দামি দামি গাড়ি চড়ে। বরকে একদম রাজপুত্রের মতো দেখতে। মহিমবাবুর শালা এসে বললেন, 'জামাইবাবু, ছেলেকে কেমন দেখছেন?' মহিমবাবুর উত্তর, 'খুব ভালো'। শ্যালক মশাই আবার গর্ব করে বলতে লাগলেন, 'জানেন জামাইবাবু, ছেলের একদম হাতে সময় নেই। বিয়ের জন্য মাত্র চার দিন ছুটি পেয়েছে। বিয়ে সেরেই বিদেশে কাজে যেতে হবে এক মাসের জন্য। মেয়ে সে সময় আমার কাছেই থাকবে।' মহিমবাবু সেকেলে মানুষ। তিনি অনেক চেষ্টা করেও বুঝে উঠতে পারলেন না, এত ব্যস্ত মানুষেরা বিয়ে করেন কেন।

বিয়ে বাড়ি ভালো ভাবেই কাটল। পরদিন সকালে মহিমবাবু তাঁর সঙ্গী ভোলাকে নিয়ে গাড়ি করে ফিরছেন। গিন্নিমা আর মেয়ে দুদিন পর ফিরবেন। মোরামের রাস্তা ধরে গাড়ি চলেছে। এ রাস্তায় মহিমবাবু খুব বেশি যাতায়াত করেননি। প্রায় দশ বছর বাদে শ্বশুরবাড়ি এসেছেন। আপন-মনে জানালার বাইরের দৃশ্য দেখছেন। মাঝে মাঝে দু পাশে পুকুর।

তাতে শালুক ফুল ফুটে আছে। গ্রামের মেয়ে বউরা পুকুরে স্নান করতে এসেছে। গাড়ি দেখে তারা একটু সংকোচ বোধ করছে। মাঝে মাঝেই বকের সারি উড়ে যাচ্ছে। কোন কোন বক আবার গরুর পিঠের উপর উঠছে। গরুটি লেজ দিয়ে বারে বারে চেষ্টা করে যাচ্ছে তাকে তাড়ানোর। বকটিও চালাক। মাঝে মাঝেই উড়ে গিয়ে আবার পিঠে এসে বসছে।

এই গাড়িটা থামাও---মহিমবাবু নির্দেশ দেন তাঁর ড্রাইভারকে। 'কি হল বাবু'-- ভোলা জিজ্ঞাসা করে। 'ভোলা, দেখেছিস—কী সুন্দর একটা বাগান! এখানে যে এত সুন্দর একটা বাগান আছে, তা তো জানতাম না। চল্ চল্, দেখি ভিতরে ঢুকে', মহিমবাবু গাড়ি থেকে নেমে পড়েন।

বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বাগানের গেট করা আছে, সেই গুলির গায়ে অনেকগুলো লতা জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে। তার সাথে হরেক রকমের নাম না জানা ফুল গেটের শোভা যেন হাজার গুণ বাড়িয়ে তুলেছে। বাগানের গেট খোলাই আছে। ঢুকব কি ঢুকব না ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত ভোলাকে নিয়ে মহিমবাবু ঢুকেই পড়লেন। বাগানের ভেতরে ঢুকেই মহিমবাবু হাঁ হয়ে গেলেন। এ যেন সম্পূর্ণ এক নতুন জগতে তিনি প্রবেশ করেছেন। গেটের বাইরে এক রকম পরিবেশ, আর ভিতরে অন্যরকম। নাম না জানা কত রকম ফুলের গাছ। কোনওটার রং নীল, কোনওটার সাদা, আবার কোনোটা লাল। নানা রঙের সমাহারে রামধনুর চেহারা নিয়েছে বাগানের একদিকটা। আরেকদিকে নানা রকমের ফলের গাছ--- আম, জাম, নারকেল, আরো কত কি। গাছের গোড়াগুলো বাঁধানো। আমের ডাল থেকে আমগুলো যেন তলার দিকে নেমে আসতে চায়ছে। মহিমবাবুর মনে হল তিনি যেন স্বর্গের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। গাছের ছায়ার আর রৌদ্র মিলিয়ে যেন এক আলো-আঁধারির মায়াময় জগৎ তৈরি করেছে। মহিমবাবু আরো খানিকটা এগিয়ে গেলেন। মাঠের ঘাস সুন্দর করে কাটা, আর তার মাঝখান দিয়ে নুড়ি-পাথর বিছানো রাস্তা। কিছুটা এগিয়ে দেখতে পেলেন একটা বড় পুকুর, বাঁধানো ঘাট। পুকুরে খই দেখে বুঝতে পারলেন যে বড় বড় মাছ সেখানে রয়েছে। জলের মাঝে লাল লাল শালুক ফুল আর তার গোল গোল পাতা পুকুরের সৌন্দর্যকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। পুকুরের ওপরটায় ধানক্ষেত, তাতে ভর্তি ধান গাছ। হাওয়া দিলে ধানগাছগুলি আন্দোলিত হয়ে ঢেউয়ের সৃষ্টি করছে। হঠাৎ দেখলেন ওই ক্ষেতের আলপথ দিয়ে একজন এ দিকে এগিয়ে আসছে।

সামনে আসতে দেখতে পেলেন একজন সুদর্শন যুবক, বয়স আর কত হবে, বড়জোর চব্বিশ কি পঁচিশ। যুবক সামনে আসতেই মহিমবাবু বললেন--কিছু মনে করবেন না, এতো সুন্দর বাগান দেখে আপনার অনুমতি ছাড়াই এখানে ঢুকে পড়েছি। যুবকটি বললেন, 'না না, তাতে কি আছে। আপনি ভালই করেছেন, আর আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করবেন না। আমি আপনার থেকে অনেক ছোট।' 'তা বেশ, তা বেশ। তোমার নামটি কি জানতে পারি?'-- মহিমবাবু প্রশ্ন করেন।

---'আমার নাম ভরত। এখান থেকে একটু দূরে আমার বাড়ি। আপনি আমার সাথে আমার বাগানবাড়িতে চলুন'।

মহিমবাবু ভরতের সাথে এগিয়ে চললেন। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা বাড়ির কাছে গিয়ে থামলেন। বাড়িটি সম্পূর্ণ পোড়ামাটির তৈরি। কোনরকম ইঁট, বালি, সিমেন্টের ব্যবহার নেই। ভিতরে বেশ ঠান্ডা। প্রাণ জুড়িয়ে যায়। ভরত মাটি থেকে জল গড়িয়ে

দিলেন মাটির গ্লাসে করে। সঙ্গে মাটির প্লেটে করে বাগানের আম, কলা আর জাম। মহিমবাবু খাচ্ছেন আর ভাবছেন এ যেন অন্য এক দুনিয়াতে চলে এসেছেন। ভিতরটা অসম্ভব শান্ত। সময় যেন এখানে থেমে গেছে। কোন তাড়াহুড়ো নেই। অতিথি আপ্যায়নের জন্য দোকানের চপ সিঙ্গারা আর মিষ্টি নেই। আপ্যায়নকারীর কৃত্রিম হাসি নেই। এখানে আছে প্রাকৃতিক খাবার আর নির্ভেজাল ভালোবাসা। 'বাবা, তুমি কি এখানে একলাই থাকো?'-- মহিম বাবু জিজ্ঞাসা করলেন।
ভারত উত্তর দিলেন, 'এখানে আমি থাকি আর কয়েকজন থাকেন যারা আমাকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করেন। তারা আজ বিয়ে বাড়ির জন্য ছুটি নিয়েছেন।'
---তা বাবা, তুমি কত দূর পড়াশোনা করেছ?
--- আমি কৃষিবিজ্ঞান মানে এগ্রিকালচার নিয়ে মাস্টার ডিগ্রী করেছি।– ভরত উত্তর দেয়।
--- তুমি এত দূর পড়াশোনা করেও কোন চাকরি করলে না?-- প্রশ্ন মহিমবাবুর।
--- না দশটা-পাঁচটার চাকরি আমাকে টানতে পারেনি। প্রথম থেকেই আমার গাছের নেশা। এই যে দেখছেন বাগান, এখানে অনেক দুর্লভ প্রজাতির গাছ রয়েছে। এক প্রজাতির সাথে আরেক প্রজাতির সংকরায়ন ঘটিয়ে আমি নতুন নতুন প্রজাতির সৃষ্টি করি। দেশ-বিদেশ থেকে বহু গবেষক আমার বাগানে আসেন। আমার বাগানের ছবি আর আমার এই কাজের কথা তারা তাদের জার্নালে লেখেন।
-- তা বাবা, তোমার বাড়িতে কে কে আছেন? তোমার সংসারই বা চালাও কিভাবে?, মহিম বাবু জানতে চান।
--- আজ্ঞে, বাড়িতে আমার বৃদ্ধ মা-বাবা আছেন। বাগানের কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে আমি তাদের সেবা করি। বহু দূর দূরান্ত থেকে বিভিন্ন নার্সারির মালিক আমার কাছে চারা কিনতে আসেন। তাদের আমি চারা বিক্রি করি। আমার চাষের চাল, বাগানের ফল, সবজি আর পুকুরের মাছে আমাদের খাবারের কোন অভাব হয় না। উপরন্তু উদ্বৃত্ত ধান, ফল ও সবজি বাজারে বিক্রি করে যে আয় হয়, তাতে বাবা-মাকে নিয়ে বছরে দুবার তীর্থদর্শনে বেরিয়ে পড়ি। আগের বারে পুজোর সময় বাবা-মাকে নিয়ে হরিদ্বার, কেদারনাথ, বদ্রীনাথধাম দর্শন করে এসেছি। এবারও আর কিছুদিন পরে পুজোর সময় মা-বাবাকে নিয়ে যাব মথুরা-বৃন্দাবন।
মহিমবাবু হাঁ হয়ে কথাগুলো শোনেন। পরক্ষণেই সম্বিত ফিরে পেয়ে প্রশ্ন করেন, 'সারাদিন কাজের শেষে সন্ধেবেলা তুমি কী কর?
---সন্ধ্যাবেলা বাগান থেকে বাড়ি ফিরে বাবা-মাকে সময় দিই। সারাদিন কি কি কাজ করলাম তা তাদের সঙ্গে আলোচনা করি। আর কিছু গরিব ছাত্রছাত্রী আমার বাড়িতে বই নিয়ে পড়তে চলে আসে। তাদের বাড়িতে ইলেকট্রিক নেই বলে তাদেরকে আমি আমার সাধ্যমত পড়া দেখিয়ে দিই। মহিমবাবু গালে হাত দিয়ে ভাবেন, এখনো পৃথিবীতে এরকম মানুষ আছে যে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও লোভনীয় চাকরির জন্য ছোটাছুটি করে না। পৃথিবীর লোভনীয় জিনিষের উপর তার আকর্ষণ নেই। সে আপন মনে নিজের সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতে আছে। এ যেন রামায়ণ-মহাভারতের যুগের সেই প্রাচীন ঋষিদের মত আশ্রমিক জীবন। আধুনিক যুগের ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা এখানে নেই, নেই অন্যকে ঠকিয়ে নিজে এগিয়ে যাবার প্রবণতা, সততার মুখোশ পরে অসৎ কাজ করার মানসিকতাও এখানে নেই।

---বাবা, তোমার বাড়িতে একবার আমাকে নিয়ে যাবে? তোমার মা-বাবার সঙ্গে একবার দেখা করবো। মহিমবাবু আগ্রহ প্রকাশ করেন।
--- তা বেশ তো, চলুন না। এইতো কাছেই আমার বাড়ি।

মহিমবাবু, ভরত আর ভোলা একসঙ্গে চললেন ভরতের বাড়ি। সুন্দর দো'তলা বাড়ি। লোহার গেটের বাইরে সুন্দর লতাবাহার গাছ। বেশ ছিমছাম পরিচ্ছন্ন উঠোন। বাড়িতে ঢুকে বাঁদিকে বসার ঘর। সুন্দর বেতের চেয়ার আর টেবিল। চারিদিকে কাঠের আসবাবপত্র। মহিমবাবু একটি বেতের চেয়ারে বসলেন। কিছুক্ষণ পর চশমা-পরা একজন ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। বোঝা গেল তিনি ভরতের বাবা। উনাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন মহিমবাবু। বললেন, 'আপনার ছেলের সাথে আলাপ করে খুব ভালো লেগেছে। তাই আপনার সাথে আলাপ করতে চলে এলাম।'
---আমার ছেলে ওই রকমই। ওকে ভালো না বেসে কেউ থাকতে পারে না। অনেকদূর পর্যন্ত পড়াশোনা করে কলেজে একটা পড়ানোর চাকরিও পেয়েছিল। কিন্তু আমাদের ছেড়ে যাবে না, তাই এখানেই ও ফার্ম হাউস করে রয়ে গেল। নিজের ছেলে বলে বলছি না, এই যুগে যে আমরা ছেলের হাতের সেবা পাব, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি এখানেই প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করতাম। এখন অবসরের পর দুই বুড়োবুড়ি এখানেই আছি। মন খারাপ করলেই ছেলের বাগানে চলে যাই, নানা রকম ফুলের সাথে কথা বলি, তাদের আদর করি, আবার মাঝে মাঝে তাদের সাথে ঝগড়া হয়। তখন তাদের অভিমান হয়, গুম হয়ে থাকে, হাওয়ার তালে তালে তখন ওরা দোলে না। আমি বুঝতে পারি, তখন তাদের একটু আদর করলে, একটু স্নেহের পরশ দিলে আবার তারা নেচে ওঠে।

মহিমবাবু আবেগভরে ভরতের বাবার হাত দুটি চেপে ধরলেন। বললেন--- আমার ব্যাংকে হয়তো প্রচুর টাকা রয়েছে, সোনা দানা গয়না-গাটি রয়েছে প্রচুর, তবুও বলছি, আপনি আমার থেকে অনেক অনেক বেশি ধনী। আমি মনের দিক থেকে আপনাদের থেকে অনেক বেশি গরিব। আমার বাড়িতে বিবাহযোগ্যা একটি কন্যা আছে। আমার একমাত্র মেয়ে। তাকে যদি আপনি আপনার পুত্রবধূ হিসেবে বরণ করে নেন, তাহলে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব।

নির্দিষ্ট লগ্নে মহিমবাবুর মেয়ের সাথে ভরতের বিবাহ সম্পন্ন হল। আত্মীয়-স্বজনেরা মহিমবাবুর কাছে না হলেও আড়ালে-আবডালে বলতে থাকলেন, মহিম একটা বোকা। এত ধনসম্পত্তি, একমাত্র মেয়ে, তার কিনা বিয়ে দিলো একটা চাষির সঙ্গে! মহিম একেবারে নির্বোধ। তার মত নির্বোধ এই ভূ-ভারতে নেই।

মহিমবাবু আর মহিম-গিন্নি কিন্তু বেশ আনন্দেই আছেন। মাঝে মাঝে মন খারাপ করলে তারা চলে যান ভরতের বাগানে। সেখানে লতার সঙ্গে কথা বলেন, ফুলের সঙ্গে খেলা করেন, আবার মাঝে মাঝে গাছকে জড়িয়ে ধরে আদর করেন। মনটা আবার ভালো হয়ে যায়। ছোটবেলার দিনগুলো আবার ফিরে আসে। আর হ্যাঁ, মহিমবাবুর এখন বছরে দুবার তীর্থদর্শন বাঁধা। এবার পূজোতে মেয়ে-জামাইয়ের পরিবারের সঙ্গে দর্শন করে এসেছেন মথুরা-বৃন্দাবন। আর কিছুদিন পরেই যাবেন বেনারস, জামাই টিকিট কেটে রেখেছেন। 'জয়বাবা বিশ্বনাথ'।